চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(কৃষি।)

[১] জুম—হল—বৈজ্ঞানিক চাষ ;

এবং

[২] ধান কার্পাসাদি উৎপন্ন দ্রব্য।

[১]

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।"

লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান অর্দ্ধমাত্রায় হইলেও কৃষি মানবের জীবন স্বরূপ। সংসারে যে সমুদয় স্বার্থকোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য মনুষ্যরক্তে লোলুপ হয়, কৃষিতে তাহারও নিবৃত্তি ঘটে। কৃষি ও শিল্পদ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্যে কেবল ধনের হস্তান্তর ঘটে মাত্র।

কৃষি।

হায়, যে ভারতে মিথিলাধীশ্বর জনক স্বহস্তে হল চালনা করিতেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া অভিমান-দৃপ্ত আমরা ঈদৃশ লোক-হিতকর কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করি! সত্য বটে অধুনা ভারতের চারিদিকে এই কৃষিশিল্প লইয়া আলোচনা চলিতেছে, এবং স্থানে স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বিরাট জনসংঘের তুলনায় সে আন্দোলন অতি সামান্য মাত্র। ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসূ; ভূভাগ প্রায় বিনা যত্নেই অনন্ত রত্নরাশি প্রদান করিতেছে। যদি আমরা কৃষির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হই, তাহা হইলে রপ্তানীরাক্ষসী শতজিহ্বা বিস্তারেও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; বরং তাহাতে রত্নগর্ভা ভারতের ঐশ্বর্য্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন, যে কৃষিকর্ম্মের প্রতি চাকমাদিগের অবজ্ঞার ভাব

মাত্রই নাই। বংশ ও শিক্ষাভিমান নির্ব্বিশেষে ইহাতে প্রায় সকলেরই আসক্তি দেখা যায়। সম্ভ্রান্ত দেওয়ান তালুকদারেরা নিজেরা সমস্ত কাজ করেন না বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও অবকাশ পাইলে অসঙ্কুচিত চিত্তে কৃষিকর্ম্মে যোগদান করিয়া থাকে, এবং পাঠ্যজীবনের উপসংহারে যতদিন না অভিলষিত কর্ম্মের যোগাড় হয়, অর্থাৎ যখন আমাদের যুবকগণ তাস-পাশার কি উৎসব-আমোদে উন্মত্ত থাকে, সেই সময়টুকুও ইহারা কৃষিপ্রভৃতি গৃহকর্ম্মের সবিশেষ তৎপর থাকে! তাই নব প্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে বড়ই উপযোগী হইয়াছে, আশা হয় কালে এতদ্বারা এদেশ পার্ব্বত্য সুইজার্লেণ্ডের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠিবে।

সমাজের আসক্তি।

বস্তুতঃ এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে কৃষির উপযোগী বিস্তর ভূমি পড়িয়া আছে; সামান্য চেষ্টা করিলেই আবাদ করা যাইতে পারে। ভূমিও বিশেষ উর্ব্বরা; তাহাতে আবার বহুকাল যাবৎ অনাবাদে পতিত থাকায় যথেষ্ট বল সঞ্চিত রহিয়াছে। এহেন ক্ষেত্রে একটু মনোযোগের সহিত চাষের নিমিত্ত খাটিলেই উন্নতি নিঃসন্দেহ। অভাবের তাড়নায় এবং কর্ম্মক্ষেত্রের ভীষণ প্রতিযোগিতায় ইহারা ক্রমেই চাষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে। এতৎপ্রতি প্রজাসাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণমানসে বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর রাজবিলাস নামক স্থানে সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে "মডেল ফারম্" খুলিয়াছেন এবং কুমার বাহাদুরও অপর এক "আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" খুলিয়াছেন। তাঁহাদের শুভচেষ্টা সফল হউক, ইহাই কামনা।

চেষ্টা।

ইহাদিগের কৃষিকর্ম্ম দ্বিবিধপ্রকারে নির্ব্বাহিত হয়। প্রথমতঃ জুম এবং দ্বিতীয় হল। এই 'জুম' শব্দটী ইতিপূর্ব্বে বহুবার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে হয়তঃ অনেকেরই কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পার্ব্বত্যপ্রদেশ মাত্রেই অর্থাৎ যে সকল ভূমিতে হল-চালনায় সুবিধা নাই তাহাতে, জুম করা হয়। সভ্য ভারতের সমুদয় পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথায় কৃষি চলিয়া থাকে। হিমালয় হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার দেখা যায়। ইহা ব্রহ্ম ও আরাকানে "টংগ্যা" এবং মধ্যপ্রদেশে "দৈয়া" নামে প্রসিদ্ধ। আর বাঙ্গালায় এই "জুম" শব্দটী 'জঙ্গম' শব্দ হইতে প্রসূত কিনা, সুধীসমাজের বিবেচ্য—কেননা ইহাও গমন অর্থাৎ স্থান পরিবর্ত্তনশীল। যেখানে এক বৎসর জুম করা হয়, ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সে ক্ষেত্রে পুনরায় সেইরূপে ফসল

জুম।

করা চলে না। সুতরাং অনায়াসলভ্য বিস্তীর্ণ ভূমি থাকিলে এই প্রথা মন্দ নহে। কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম প্রয়োজন হইলেও যৎসামান্য মূলধনে চলিতে পারে। অথচ বার্ষিক চারিটাকা মাত্র রাজস্বে—এক দম্পতী সচরাচর দুই একর, নিয়মিত পোড়া (কেননা ভালপোড় না হইলে জুমক্ষেত্রে ঘাস কম হয় বলিয়া পরিশ্রমের লাঘব ঘটে,) তওয়ার উপযোগী "আকাব্‌বন" (নিবিড় জঙ্গল) পাওয়া গেলে, চারি একর পর্য্যন্ত জুম করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ সাধারণ পরিবারে ইহাই একমাত্র উপজীব্য। সেন্সাস রিপোর্টে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহাদিগের ১৪৭৭২ পুরুষ ও ১২৭৮৯ স্ত্রীলোক কৃষিজীবী ; তন্মধ্যে ১৪০২৩ পুরুষ ও ১২০৬০ স্ত্রীলোক জুম করিয়া থাকে।

জুমের ফলাফল।

পরন্তু এই জুম প্রথার ফলাফল লইয়া বর্ত্তমানে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহাতে প্রধান আপত্তির কারণ—প্রথম বন্যদ্রব্য নষ্ট হয়, দ্বিতীয় তাহাদের স্থিতিহীনতা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই প্রথম আপত্তি সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। কারণ যে যে স্থানের বনজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হওয়ার সুবিধা আছে, গভর্ণমেণ্ট প্রায় তত্তৎস্থানসমূহ, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রায় চতুর্থাংশ ভূমি (১), রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যে সকল স্থানের বন্যদ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই, জুমপ্রথা না থাকিলে সে সব ক্ষেত্র পতিত থাকিত। এক্ষণে সেই সকল স্থানে কত ধন সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে। তদ্বারা দেশেরও কত উপকার হইতেছে এবং গভর্ণমেণ্টও কত রাজস্ব লাভ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ইহাতে চাষের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা নাই। কেননা পাহাড় (যেখানে চাষ চলে না) ছাড়া জুম হয় না। আর এই পাহাড়গুলি প্রধানতঃ বাঁশবনে আচ্ছন্ন, জুমিয়ারা প্রধানতঃ বাঁশবন অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করে। বাঁশের উৎপাদিকাশক্তি এত অধিক যে, একবার জুম করিয়া গেলে—৫।৬ বৎসরের মধ্যে সেই ভূমি পুনরায় জুমের উপযুক্ত হয় না। কিন্তু জুমে জঙ্গল কমায় বলিয়া বৃষ্টিও কমিয়া যাইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার মিঃ কোর্ব্বস্ একথা বলিয়াছিলেন, "এই জুমের ফলে কর্ণফুলী নদী এক সময়ে বালিতে মজিয়া যাইবে।" বস্তুতঃ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া

(১) প্রায় ১৩৮৫ বর্গমাইল ছিল। তন্মধ্য হইতে "চাষের ভূমির বিস্তারের নিমিত্ত" গত ১লা মে (১৯০৯) মাননীয় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট মাইনী উপত্যকাংশীভূত 'রিজার্ভ' ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উঠিতেছে, এখন শীতকালে ইহার অনেক স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় (১)। সম্প্রতি "নাইন্টিন্থ্ সেন্চুরী" নামক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, নিস্বেট ইহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন, জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে সন্নিহিত ঝরণাগুলি শুকাইয়া যায়; কাজেই শীতসমাগমে নদীর জল কমিয়া আইসে। তিনি আরও বলেন, জঙ্গলকর্ত্তনে নিকটবর্ত্তী ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস হয়; সুতরাং আবাদী ভূমির পরিমাণ বেশী হইলেও, ফলে উৎপন্ন অধিক হয় না। দ্বিতীয়তঃ জুমদ্বারা যে স্থিতিহীনতা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা কতকটা সত্য বটে। যদিও অধুনা কোন কোন জুমিয়ার স্থায়ী বাসস্থানও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা খুবই বিরল এবং অধিকাংশই চিরস্থায়ী নহে। দুঃখের বিষয় চাক্মাদিগের অনেকেই অমিতব্যয়িতায় প্রায় রিক্তহস্ত থাকে, মূল ধনের অভাবে বাধ্য হইয়া জুমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে বাধ্য হয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীর মঘগণ তেমন নহে।

পৌষ-মাঘ মাস হইতেই ইহারা জুমের উপযোগী নিবিড় বনভূমি অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরন্তু জুমক্ষেত্র যথাসাধ্য একে অপরের অনতিদূরে নির্ব্বাচন করিবার চেষ্টা করে; তাহাতে বীজবপন, ঘাস উৎপাটন, ফসল সংগ্রহ প্রভৃতিতে ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য পায়। ফাল্গুনের প্রারম্ভে—যখন মলয়কর সঞ্চালনে তরুলতা নবীন-ললিত সুষমা ছড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ আকুল করিয়া তোলে, এবং বসন্তের এহেন সজ্জায়—কোকিলের অশ্রান্ত অনুরাগে পরসুখকাতরা বিরহিণীগণ অন্তরে অন্তরে তুষানলে জ্বলিতে থাকে, তাহাদিগের সহানুভূতিতেই যেন সেই

কর্ত্তন ও দাহন।

সুখ-দুঃখের সম্মিলনকালে "জুমিয়াগণ" বিরহিণীকুল-বৈরী বৃক্ষ-বল্লরীর সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা পূর্ব্বপুণ্য-ফলে বিরাটকায়, অথচ ফসলের কোন অনিষ্ট ঘটাইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বৃক্ষগুলি মাত্র বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেই যে হতভাগ্যগণ যন্ত্রণাদায় হইতে রক্ষা পাইল তাহা নহে; অনন্তর যখন চৈত্রশেষে হুতাশনের লোলজিহ্বায় "খাণ্ডবদাহন" অভিনীত হয়, তখন মনে হয়, এরূপ মরমে জ্বলিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের সে সময়েই জুমিয়াদিগের করাল "তাগলা"ঘাতে নিহত

(১) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সার লেন্স্লেট হেয়ার কে, সি, এস, আই; সি, আই, ই, মহোদয়ের গত পরিদর্শনকালে স্থানীয় অধিবাসিবর্গ কর্ণ ফুলীর এই চর কাটাইবার প্রার্থনা উপস্থিত করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বিশেষ আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। আশা করি অচিরে অন্ততঃ রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত শীতকালে অবাধে ষ্টীমার চলিবার সুবিধা ঘটিবে।

হওয়া ছিল ভাল! কর্ত্তনপর্ব্বের পর হইতে ইহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণও প্রাণান্তপণে স্বামীর সহায়তায় তৎপরা হয়। ইহাদের সেই কর্ম্মজীবন বর্ণনার অতীত! চৈত্রের খরতর মার্ত্তণ্ডময়ূখমালা ধূ ধূ করিয়া জলিতেছে, মনে হয় যেন —স্মরহর এবার কালাগ্নি সদৃশ কোপবহ্নিতে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীকরণে উদ্যত হইয়াছেন, সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া জুমিয়া দম্পতি অনাবৃত মস্তকে—অবিচলিত উৎসাহে স্বকার্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছে! দরদর ধারায় ঘর্ম্ম প্রবাহিত হয়, ধমনীনিচয়ের ঘন ঘন সঞ্চালনে গৌরাঙ্গ আরক্তিম হইয়া উঠে, এই অবকাশে একবার পরস্পরের দৃষ্টিতে আসিলে যাবতীয় ক্লান্তি অবসান পায়, বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়! সুরসিক যাহারা সেই নির্জ্জন প্রদেশে উদ্‌ভ্রান্ত রাগিণীর লহরী তুলিয়া অপূর্ব্ব প্রণয় সঙ্গীতে আকুল পিয়াসা চরিতার্থ করে; এবং গানের উপসংহার সূচক "কুই" ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রাণের উৎফুল্লভাব পরিস্ফূরিত হয়। এতদ তিরিক্ত উপহাস-বিদ্রূপ এবং ঠাট্টাকৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি কতই আছে! দম্পতির এহেন সম্মলিত শ্রম কত যে বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ, তাহা কল্পনায় আসিবে না,—কার্য্যে অনুভব করিবার সামগ্রী !!

বস্তুতঃ জুমে অগ্নিসংযোগ এক ভীষণ ব্যাপার! সে সময়ে সবিশেষ সাবধান না থাকিলে বিষম অনিষ্ট, এমন কি প্রাণ-বিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আগুণ লাগিলে চৌদিগ্‌বদ্ধ গিরিগুহায় বায়ুদেব দিশাহারা হইয়া যান, তাই রোষে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া আততায়ীর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করেন। এইরূপে সমুদয় বনস্থলীতে ঘোর দাবদাহ উপস্থিত হয়, কোন কোন সময় সেই উদ্দাম হুতাশন-জিহ্বা লোকবসতি আক্রমণ করিয়া অসীম ক্ষতি সংঘটিত করে! আগুণ দিবার পূর্ব্বে শুষ্ক বৃক্ষবল্লীর এমনি সুকৌশলে সাজাইতে হয়, যেন সর্ব্বাংশে সমভাবে জ্বলিতে পারে, এবং তাহা অকর্ত্তিত জঙ্গলের সহিত সম্পূর্ণ বিছিন্ন থাকে। সচরাচর বাতাসের নিশ্চল সুযোগেই অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখন জুমিয়া দম্পতি সপল্লব শাখা-হস্তে অনলদেবের সীমা রক্ষা করে। যদি সর্ব্বভুকের অব্যাহত প্রভাবে নিতান্ত বৃহত্তর কাষ্ঠগুলি ব্যতীত আর সমুদয় ভস্মসাৎ হইয়া একাধিক ইঞ্চি পরিমিত ভূপৃষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা জুমের শুভলক্ষণ মনে করিয়া থাকে। অনন্তর দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলিকে ক্ষেত্রপার্শ্বে সরাইয়া ফেলে; তাহারই সাধারণ সংজ্ঞা—'আনুনী-চুতা', আমাদের কথায়—প্রথম বাছন।

আনুনী-চুতা।

এক্ষণে বপনের কার্য্য। বরুণদেব পবিত্র স্নেহধারায় ধরিত্রীকে শীতল করিলে,

জুমিয়া পরিবারের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই কটিদেশে ধান্য, তিল, তুলা, লাউ, কুমুড়, শসা, আলু, কচু, মার্কা, বেগুণ, চিনার, কার্পাস, তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ শস্যের বীজপূর্ণ "কুরুং" লইয়া "চুচ্যাং তাগল" হস্তে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাগল দ্বারা দক্ষিণ হস্তে সমদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া বামহস্তে তন্মধ্যে কতক মিশ্রিত বীজ রোপণ করে। এই সকল গর্ত্ত তিন ইঞ্চির অধিক গভীর করা হয় না; বীজবপনের পর সামান্য মৃত্তিকা উপরিভাগে চাপা দেওয়া হয়।

বপন।

অনন্তর বৃষ্টি পড়িলে যখন যাবতীয় শস্যের চারা উঠিয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল আগাছা জন্মে, তৎসমুদয় অন্ততঃ তিনবার পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। প্রথমবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বাছন হয়, তাহার নাম—"বীজপোতনা"। দ্বিতীয়বার আষাঢ় মাসে এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ বাছন প্রায়শঃ শ্রাবণ মাসেই হইয়া থাকে। এই দুই "ছুতা"কে ইহারা যথাক্রমে "চুতীকুচ্যা বা কোমর ছুতা এবং "মিরছুতা" সংজ্ঞায় অভিহিত করে; এতদ্ব্যতীত জুমক্ষেত্র নিড়ানের আবশ্যক হয় না। পরন্তু জুম-কৃষিতে বৃষ্টি অধিক হইলে তরি-তরকারীর গাছগুলি প্রায় নষ্ট হয়, কার্পাসেরও অপকার ঘটে।

"বীজপোতনা," "কোমর ছুতা" ও "মির ছুতা"।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন ফসল বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে, সে সময়ে তাহারা "জুম পূজায়" ব্রতী হয়। ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনও বনস্পতি-ছায়ায় বাঁশের একটি কার্পাসবৃক্ষাকৃতি প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাদের মোট যত দেবতা আছেন, প্রত্যেকেরই উদ্দেশে এক একখানি "মায়েই" দুই-দু'খানি পাতায় গাঁথিয়া তন্মূলদেশে প্রোথিত করিয়া থাকে। প্রথমে "বৃহত্তারা" দেবের পূজার নিয়ম, অনন্তর গঙ্গাপূজা। ইহাতে নদীকূলে দুইটি ছাগল বলি দিতে হয়। পরে "গইরা" প্রভৃতি অপ-দেবতাকে পূজা করিয়া একটি শূকর, ১৬টি মোরগ এবং হাঁস, পারাবত ইত্যাদি বলি দেয়। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণের আড়ম্বরও কম নহে, পূজায় মদ্যই প্রধানতম উপচার। সঙ্গে একখানি "তাগল"ও দেওয়া হয়। অতঃপর ধান পাকিলে "মা-লক্ষ্মী-মা"র পূজা করিবার রীতি আছে। ইহাতে পূজা পদ্ধতির কিছুই নাই, কেবল ওঝা ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া একটী শূকর অথবা দুইটি মোরগ কাটিয়া দেয়, এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ মদও ঢালিয়া দিতে হয়। তার পর এক গুচ্ছ ধানগাছ "থুরুং" মধ্যে পৃষ্ঠোপরি লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে পরিবারের সকলে "লক্ষ্মী মা আস" "লক্ষ্মী-মা আস" বলিয়া ধান্য-

জুমপূজা।

গুচ্ছকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গৃহে লইয়া যায়, এবং উচ্চ স্থানে স্থাপন করে। তৎপর একখানি "মেজাং" এর উপর থালা কি পাতায় ভাত ও বলিহত প্রাণীর একখানি পা ও মস্তক সাজাইয়া "লক্ষ্মী-মা"র সম্মুখে তুলিয়া রাখে, পরিশেষে সমাগত সকলকে পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয় এবং প্রসাদীভোজ্য নামাইয়া লয়।

পাহারা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বন্যপশুর উপদ্রব হইতে ফল রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুম-ক্ষেত্রের উচ্চতম শৃঙ্গোপরি "মইন ঘর" প্রস্তুত করিয়া থাকে। জুমিয়াগণ এই সময়ে বৃদ্ধ বা নিতান্ত অক্ষমদিগকে মাত্র গৃহে রাখিয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ এখানে আসিয়া বাস করে। বন্য হরিণ, শূকর, কুকুর প্রভৃতির উৎপাত অতিশয় ভয়ানক; বিশেষতঃ ক্ষেত্রে দৌড়া-দৌড়ি করিলে শস্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর উৎপন্ন ফসল সংগৃহীত হইলে ইহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ফসল সংগ্রহ।

বলা বাহুল্য, যাবতীয় ফসল এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ লাউ, কুমড় শসা, বেগুন, মার্ফা, চিনার, তরমুজ, ভুট্টা, ইত্যাদি যথাক্রমে দেখা যায়; পরে প্রায় আশ্বিন মাসে ধান পাকে। কার্পাস ও তিল পাইতে কার্ত্তিক মাস আসিয়া পড়ে, এই তাহাদের শেষ ফসল। কাপ্তান লুইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১),—এক দম্পতি বৎসরে নয় কাণি (প্রায় এগার বিঘা) জমিতে জুম করিতে পারে। এই ভূমিতে বীজের নিমিত্ত গড়ে ৭ আড়ি (২) ধান, ৩ আড়ি কার্পাস এবং এই অনুপাতে তিল, ভুট্টা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। তদ্ভিন্ন তরি-তরকারীর জন্য লাউ, কুমড়, মার্ফা, শসা প্রভৃতির বীজের আবশ্যক। নিম্নে তাঁহার নির্দ্ধারিত আয়ব্যয়ের তালিকাখানি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—

উপরি-নির্দ্দিষ্ট জুম-আবাদে আনুমানিক শ্রম-মূল্য,—

"জঙ্গল পরিষ্করণ— একজনের ২০ দিন—দৈনিক মজুরী পাঁচ আনা হিসাবে ৬।০

বৃহত্তম, কাষ্ঠাদি স্থানান্তর

করণ ও সাজান—" " ১০ " " " ৩৸০

(১) Appendix D (The Joom),—The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers there in.

(২) এক আড়ির ওজন প্রমাণ চৌদ্দ সের।

দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠ ভূমক্ষেপণ—দম্পতির	১০	„	„	„	৬।০
বীজবপন—	৭	„	„	„	৪।৶০
ঘাস উৎপাটন (প্রথমবার)	২৪	„	„	„	১৫৲
„ (দ্বিতীয়বার)	১২	„	„	„	৭॥০
„ (তৃতীয়বার)	৬	„	„	„	৩৸০
ধান কাটা—	৩৬	„	„	„	২২॥০
শস্যাদির গুঁড়ি কর্ত্তন—	৩	„	„	„	১৸৶০
কার্পাস তোলা (প্রথমবার)	১৮	„	„	„	১১।০
„ (দ্বিতীয়বার)	২৭	„	„	„	১৬৸৶০
„ (তৃতীয়বার)	৩	„	„	„	১৸৶০
শস্য আহরণ এবং কার্পাসের খোসা ছাড়ান—	১২	„	„	„	৭॥০
					১০৮৶০

বীজের মূল্য—৪॥০
দা-প্রভৃতি— ২॥০
ঝুড়ি প্রভৃতি—৮৲
১৫৲ ... ... সর্ব্বমোট—১২৩৶০

"এক্ষণে দেখা যাউক উল্লিখিত ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসলের মূল্য পরিমাণ কি হইতে পারে :—

ধান্য—১৮০ আড়ি, টাকায় ৫ আড়ি হিসাবে	...	৩৬৲
কার্পাস—১২/০ মণ, মণপ্রতি মূল্য তিন টাকা	...	৩৬৲
তিল ও তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য—	...	৪৲
		৭৬৲
এতদ্ব্যতীত বাঁশকাটা, নৌকাগঠন প্রভৃতি দ্বারা অতিরিক্ত উপার্জ্জনে যেন—		৩০৲
	সর্ব্বমোট	১০৬৲

"কিন্তু এক দম্পতির বৎসরের নৈমিত্তিক খরচ যথা,—

ধান্য ১২০ আড়ি,	...	...	মূল্য	৩০৲
মৎস্য ...	...	...	„	৪৲
তৈল ...	...	...	„	২৲
লবণ-মরিচ প্রভৃতি	...	...	„	৬৲
সুপারি-তামাক প্রভৃতি	...	...	„	১০৲
কাপড় ...	...	...	„	১২৲
পূজা প্রভৃতি	...	...	„	৮৲

উৎসবাদিতে	...	...	,,	৬৲
চিকিৎসা ব্যয়	...	...	,,	৭৲
অলঙ্কার-বিবাহাদিতে ব্যয়...		...	,,	১৫৲
জুমের দা প্রভৃতিতে	...	...	,,	২॥৹৲
,, বীজ ,,	...	...	,,	৪॥৹
			মোট	১০৬৲"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তৎসমস্তই অতি আবশ্যকীয় খরচেই শূন্য হয় (১)। তদ্ভিন্ন জুমকর ও অপরাপর অপরিহার্য্য কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদিগকে হয়ত এ সকলকে সংক্ষেপ করিতে হয়; নতুবা ঋণ নিশ্চিত। আমি রাজপুরুষের উপরোক্ত তালিকার কোনও পরিবর্ত্তন করি নাই।

জুমিয়ার অভাব।

অথচ তিনি যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহাদিগের পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। পরন্তু ইতিমধ্যে ইহাদিগের উপর কয়েকটি নূতন কর চাপান হইয়াছে এবং কালের কুটিল গতিতে সাংসারিক খরচের মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহাদিগের যে অমিতব্যয়িতার উদাহরণ দিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও এই তালিকা-নির্দ্দিষ্ট পথেও পরিবার পরিচালন দুরূহ ব্যাপার। অনেকেই তাদৃশ দুঃসময়ে অনশনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় এবং সামান্য অনাবৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস করাল-জিহ্বা বিস্তার করিতে থাকে।

পূর্ব্বে এদেশে হল চালনার প্রচলন ছিল না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লুইন বলিয়াছেন (২), "হলকর্ষণ দ্বারা কৃষি করে এমন একজন পাহাড়ীকেও আমি

হল।

জানি না; বাস্তবিক জুম ব্যতীত অন্যবিধ উপায়ে জীবিকার্জ্জন কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় সম্পন্ন ব্যক্তির বাসসমীপবর্ত্তী সামান্য ভূমিখণ্ড মাত্র কোন কোন সময়ে হলকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা তজ্জন্য বাঙ্গালী চাকর নিযুক্ত করিয়া থাকে। সম্প্রতি "বন্য সংরক্ষণী (Forest Reserve) বিধি" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর তাহারা (জুমের ক্ষেত্রাভাবে) লাঙ্গলের চাষ অবলম্বন

(১) বর্ত্তমানে ধান্য-কার্পাসাদি যেমন মহার্ঘ হইয়াছে, সেই অনুপাতে মজুরের বেতনও দ্বিগুণ চড়িয়া গিয়াছে।

(২) The Hill Tracts of Chittagong and dwellers therein—P. 13-14.

করিবে।" শরস্ত তাঁহারই তিন বৎসর পরবর্ত্তী মত (১),—"চাকমাদিগের মধ্যে এমন এক শক্তি জন্মিতেছে যে, তাহারা হেড্‌ম্যানদের হইতে স্বকীয় স্বার্থ প্রথমে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধানুরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা পাঁচবৎসরের মধ্যে এই জাতির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কৃষক হইতে পারিবে।"

তদীয় ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সহৃদয়তা এবং স্বর্গগত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও নীলচন্দ্র দেওয়ান মহোদয়দ্বয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে এদেশে যে, লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, অধুনা তাহা বহুল বিস্তারিত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন এসম্বন্ধে আপত্তি উঠে, সরকার বাহাদুর অতি ধীরভাবে তদ্বিচার মীমাংসা করিয়াছেন (২)।

চাষে সাহায্য।

তাহা ছাড়া, ১৮৯২ সালের আইন প্রণয়নকালেও ইহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। প্রথম তিনবৎসর সম্পূর্ণ নিষ্কর ভোগদখল করা যায়। পরে একবার চোয়ালিয়া নিরিখে যে কর নির্দ্ধারিত হয়, তাহা দশ বৎসর যাবৎ অপরিবর্ত্তিত থাকে। সাধারণতঃ হালচাষের প্রতি লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি মানসে করের হার খুবই কম রাখা হয়। রাজা এই প্রাপ্ত করের ষোড়শাংশ মাত্র পাইলে হেড্‌ম্যান অষ্টমাংশ পাইবার ব্যবস্থা হয়। তাহাতে ইহার কারণও লিখিত রহিয়াছে। হেড্‌ম্যানগণ চাষকার্য্য বিস্তৃত করিতে অধিকতর চেষ্টা করিবেন আশায় তাঁহাদিগকে রাজা হইতে এত অধিক পরিমিত লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বিধিতেও চাষকরের প্রাপ্ত টাকাপ্রতি হেড্‌ম্যানের তিন আনা এবং রাজাবাহাদুরের ভাগে দুই আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বড়ই সুখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষের এতাদৃশী চেষ্টা ফলবতী হইতে আরম্ভ হইয়াছে (৩)। অধুনা চাকমাদিগের চাষের প্রতি একটু মতিগতি ফিরিয়াছে। উপযুক্ত মূলধন সংগৃহীত হইলে ইহারা স্বতঃই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ফেণী ও চেঙ্গীর তীরবর্ত্তী সমতল ভূমি

চাষের বিস্তার।

(১) Letter No. 532——To the Commissioner of Chittagong, dated 1st. July 1872.

(২) See the offg. secretary of Bengal—Mr. A. P- Macdonall's letter No. 1985-797 L. R. dated 1-9-1881.

(৩) সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৯০৩-০৪ সালে
চাকমা সার্কেলে ৬০৯৫ একর ১ রোড ৩৩ পোল—

সমূহে একমাত্র হল চালনাতেই আবাদ চলিতেছে; তথাকার জমিগুলিতে উৎপাদিকা শক্তিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে এই চাষবিস্তারের ফলে—ইহারা যে পূর্ব্বে নিয়ত বসতি স্থানান্তরিত করিত, তাহা বহু কমিয়াছে; এক্ষণে অনেকেই স্থায়ী বাড়ীঘর প্রস্তুত করিতেছে।

কিন্তু ইহাদিগের ভিতর এই চাষবিস্তারের মূলে বাঙ্গালীদিগের সহায়তাও কম উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন ডেপুটি কমিশনার মিঃ পাউয়ার বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরের নিকট যে (নম্বর-৪৭২) পত্র দেন, তাহাতে উল্লিখিত ছিল,

বাঙ্গালী সাহায্য।

"এই জিলায় ত্রিবিধ প্রথায় ভূমির চাষ হয়। ১। কেবল মাত্র বাঙ্গালীদিগের চাষ, ২। বাঙ্গালী ও চাক্‌মাদিগের সম্মিলনে চাষ (রাঙামাটি ও নীলচন্দ্র দেওয়ানের গ্রামে) এবং ৩। পাহাড়ীগণদ্বারা কর্ষণ।" পরবর্ত্তী কমিশনার মিঃ বীমস্‌ও বাঙ্গালীসংসর্গজনিত এই উপকার স্বীকার করিয়াছেন (১)। তবে আক্ষেপের কথা এই যে, এত বৎসরের সহায়তাতেও চাক্‌মাদিগের অধিকাংশ এযাবৎ সম্পূর্ণ অনন্যনির্ভর ভাবে লাঙ্গলের কাজ চালাইতে পারে না; বাঙ্গালী ভৃত্য রাখা অনেকেরই আবশ্যক হইয়া পড়ে। শুনিতেছি "রাজবিলাস মডেল ফারমে" রাজাবাহাদুরের কোনও লাভ নাই, অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাহার কারণ, একেত পরনির্ভরতা, তাহাতে আবার বিজাতীয় বিদেশীয় চাকর, তাহাদের তত সহানুভূতি থাকিবে কেন? যাহা হউক, তথাপি যে তিনি নিজে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও প্রজাসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি যথার্থ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র! পরনির্ভর হইলেও ইহারা যে চাষে পাহাড়ী আর সকলের দৃষ্টান্তস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

এই ত গেল ধানের চাষের কথা; ইক্ষুর চাষও ইহাদের মধ্যে সাতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সুবিধাও আছে মন্দ নহে। একবার বপন করিলে তিন বৎসর যাবৎ ফসল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহারা এতাদৃশী সুবিধার কথা অবগত ছিল না। কয়েক বৎসর হইল অত্রত্য বাঙ্গালী অফিসার (officers)

বোমাং সার্কেলে ৪১১২ একর ২ রোড ১০ পোল

মঙ্ " ৪১৭৪ ,, ২ ,, ৩২ ,, ভূমির আবাদ হইয়াছে। তাহার রাজস্ব পরিমাণ ২২০০০৲ টাকা। কিন্তু ১৮৭৫ সনে কৃষিসংক্রান্ত কর মাত্রই ছিল না।

(১) See the letter No. 227 H. dated 5-9-1879.

বাবুরা যৌথ মূলধনে রাঙামাটির পার্শ্ববর্ত্তী মাঠে ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিচালকের ত্রুটিতে তাহা অকালে ধ্বংস হইলেও তদ্দ্বারা পার্ব্বত্যদিগের ইক্ষুচাষের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহারা শীতকাল আসিলে শুষ্ক নদী-সৈকতে তাম্রকুট বীজ বপন করে। ইহাতে বিশেষ কোন পরিশ্রম নাই, তেমন শক্ত বেড়াও দিতে হয় না। কেবল মাত্র কষ্ট এই যে, পাতার মূল দিয়া যে সমুদয় নব-মুকুল বাহির হয়, প্রত্যহ তৎসমস্ত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রয়োজন; নতুবা পত্রগুলি সতেজ হইতে পারে না। আর হলকৃষ্ট ভূমিতে সরিষাও ছড়ায়। শীতাগমে ফুল ফুটিলে ক্ষেত্রের হরিদ্রাভায় দূর হইতে দর্শকের নয়নপ্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায়!

ইক্ষু, তামাক ও সরিষার চাষ।

"রাজবিলাস মডেল ফারমে" নবপ্রচলিত বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয় না। কিন্তু কুমার রমণী বাবু স্বীয় "আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে" এনিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। তিনি চট্টগ্রাম "বিভাগীয় কৃষিসমিতি"র অন্যতম সভ্য; সুতরাং তাহাতেও সাতিশয় সাহায্য পাইতেছেন। তা' ছাড়া কৃষিসম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তিকা এবং মাসিকপত্র অবলম্বনে তাঁহার যাদৃশী চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে আশা হইতেছে,—"আদর্শ কৃষিক্ষেত্র" কালে নিশ্চিতই সফলতা প্রদান করিবে। সব্‌ডেপুটি বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান কৃষিবিষয়ক গ্রন্থাদির সাহায্যে তদীয় রাঙামাটি বাসার অনতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণে বৎসর বৎসর শাকসব্জীর চাষ করিয়া থাকেন। মৃত্তিকার অনুর্ব্বরতানিবন্ধন তাঁহার বহু চেষ্টাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। বাবু কৃষ্ণকিশোর দেওয়ান তাঁহার বাড়ীতে আলুর চাষ করিয়াছিলেন তদুৎপাদিত এক একটা আলু ওজনে প্রায় আধপোয়া তিনছটাক হইবে; কিন্তু আস্বাদে ননীতালের আলুর সমান নহে। তথাপি ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে। এজন্য তিনি অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র! 'কাচালঙের মুখ' নিবাসী বাবু ইন্দ্রজয় দেওয়ানের নাম এস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি গতপূর্ব্ব প্রদর্শনীতে সকলকে দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছেন যে, এই পার্ব্বত্য মৃত্তিকাগর্ভে বিস্তর বহুমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে! প্রধানতঃ তাঁহার উৎপন্ন কলা, মূলা, সালগম, বেগুণ, কুমুড় ও কচু সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বীয় অসামান্য অধ্যবসায় এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ

বৈজ্ঞানিক চাষ।

কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষিবিদ্‌গণের প্রচারিত গ্রন্থ সাহায্যেই তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় প্রদর্শনীর উচ্চতম পুরস্কারও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। যদি সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এজন্য তদীয় পোষকতা করেন, তবে তিনি আরও উন্নতি করিতে পারিবেন,—আশা করা যায়।

[২]

ধান্য—নানাজাতীয়। তন্মধ্যে আবার প্রত্যেক জাতি কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—বিনি দ্বাদশ প্রকার। "কবা বিনি" (১), "বাঁদরা" বা "মুখ বিনি", শূকরের "লো-বিনি", "পেরৈৎছা বিনি", "ফোৎছা বিনি", অথবা "লবা বিনি", "খোবা বিনি", "উত্তরো বিনি", "রাতা বিনি", "কুড়ি বিনি", "লকা বিনি", "থেবি বিনি", "লঙ্কাপোড়া বিনি" ইত্যাদি। "তুর্কি" দুইপ্রকার, সাদা ও কাল। "বাউৈয়া" ত্রিবিধ—"বড় বাউৈয়া", "ছোট বাউৈয়া" এবং "চিকণ বাউৈয়া"। "কাত্রং"ও তিন জাতীয়—বড়, ছোট ও চিকণ। "ছুরী" দ্বিবিধ—"জৈট ছুরী" এবং "এমি ছুরী"। এইগুলি প্রায় ভাদ্রের শেষভাগে পাকে। আর সকলের মধ্যে "মেইলি" দুইপ্রকার—"মেইলি" ও "রঙ্গী"; কবোরক ষড়বিধ—"কলা", "রাঙা", "ধোবি", "হৈইল", "লুমক্র" ও "পেলাং"। এই সমুদয় এবং "গেইলং" প্রভৃতি শ্রাবণের শেষ কি ভাদ্রের প্রথমেই পরিপক্ক হয়। এতদ্ভিন্ন "ট্যার্থো", "পর্তকি" ও মধুমালতী প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে, আশ্বিন মাসে পাকিয়া যায়; এবং "কামইন ধান" ভাদ্রমাসের মধ্যেই পাকে।

ভুট্টা।—স্থানীয় নাম মোক্কা, ইহা চারি জাতীয়। যথা,—"বিনিমোক্কা", "চিত্রমোক্কা", "লালমোক্কা" ও "ধোপমোক্কা"। এগুলিও ভাদ্রমাসের মধ্যে পাকিয়া যায়।

তিল—দুই প্রকার; সাদা ও কাল। কিন্তু
সরিষার—কোনও প্রকার ভেদ নাই।

কার্পাস (২)—দ্বিবিধ; "ফুলসুতা" ও "বিনিসুতা"। "ফুলসুতা" ধবলবর্ণ ও উৎকৃষ্ট। জুমে প্রধানতঃ ইহারই চাষ হয়। "বিনিসুতা" গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ—

(১) আমরা এস্থলে অসুবিধায় পড়িয়া কোটেসন চিহ্নে চাক্‌মা নাম দিতে বাধ্য হইলাম।

(২) কার্পাস এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু এসকল কার্পাস অতি নিকৃষ্ট। বস্ত্রসূত্র পক্ষে এ সমুদয় সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইহার অধিকাংশ পশমের সহিত মিশাল দেওয়ার নিমিত্ত জর্ম্মানিতে চালান যায়। যদি সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ বিতরণ করেন, তবে বড়ই উপকার হয়।

কেহ ইচ্ছা করিয়া ইহার বীজ বপন করে না। "ফুলের" বীজের সহিত ইহার বীজ মিশ্রিত হইলে সামান্য পরিমাণে দেখা যায়।

তামাক—"কফিপাতা", "খোলমোকরা" প্রভৃতি নানাজাতীয় আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত রকমই প্রধান।

আউক ও—দুই তিন রকমের আছে, তন্মধ্যে "খাওর্গ্যা" শ্রেণীর নূতন আমদানী হইয়াছে। ইহার ছাল শক্ত বলিয়া বন্য পশুতে নষ্ট করিতে পারে না। ইক্ষুর স্থানীয় নাম—"কুছ্যাল্," চট্টগ্রামে "কুস্তার" বলে।

আলু—"মোম (লাল) আলু", "বাঁশতারা আলু", "ছিমি আলু," "রেং আলু", "জুরো আলু", "কুইয়াং আলু", "লাল ফেইলা আলু" এবং "সাদা ফেইলা আলু" প্রভৃতি।

কচু—"ওল কচু" (ওজনে প্রায় ১½ মণেরও অধিক হয়), মানকচু, "চাক্‌মা কচু","কুল্‌পা কচু", "বিনি কচু","শুক্‌না কচু" "কস্তুরী কচু","নদে কচু" "বিষ কচু", "ছ-কচু" প্রভৃতি স্থলজাত। এবং "পান্সা কচু", "হেরা কচু", "মোদ্দম কচু", "কাল গোয়ারী কচু," ও "সাদা গোয়ারী কচু" ইত্যাদি জলজ।

তরি-তরকারী।—বেগুণ দ্বিবিধ—"বারমাস্যা বিগুণ" ও "জৈট্ বিগুণ"। এতদ্ভিন্ন "মাবাঙ্গা", "চিন্দিরা", সশা, "কুদুগুলা" (লাউ) (২), "ছুঁউরীগুলা" (কুমড়) "কাঁ'রাগুলা" (কাঁক্‌রোল), "তিতাগুলা" (উচ্ছে). "ঢেরস", ঝিঙা, "কৈঁদা", "ছমি" (সিম), "ছুমিছমি" (অরহর); শাকের মধ্যে পুঁইশাক, "ছাব্রেংশাক", "ফুছিশাক", "ওজোনশাক", "মারিস শাক", "নারিচ শাক" "গাং-কুল্যা শাক", "ইয়ারং শাক", কচুশাক, ঢেঁকি শাক এবং লেংরা শাক ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন—

লঙ্কা ও—নানাজাতীয় আছে; এবং বাথয়ের মধ্যে "রাইবাহর", "জুম্মোয়া বাহর" প্রভৃতিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

---

(১) ইহারা যাবতীয় 'ফল' অর্থেই "গুলা" শব্দ ব্যবহার করে। এই সঙ্গে এতদ্দেশে উৎপন্ন কতিপয় বন্য ফলেরও তালিকা রাখিয়া গেলাম। যথা,—"ঘেরে আম", "রামকলা" "কেরেঙ্গা", "হাজা লেমু" (পাতিলেমু); "কন্নাল" (বাতাবি লেমু), "তুরুঙ্গা", "মিঢালেমু", "নারেং কমলা", "কাদালেমু", "পুরুরেং", "ধল-কো", "রোগুচ্-কো" "পুণৎপাতা-কো," "আম্রা" (আমড়া), "জলপেই", "কাদামালা", (আমলকী), "হত্যল্" (হরিতকী), "বঁড়াগুলা "(বহেরা), "কুহমগুলা", "ভারাত্তাগুলা", "পিলাগুলা", "দেমলগুলা", "ছুবেইগুলা", বত্তাগুলা, "জেইংগুট্ গুট্যা", "মযগুট্ গুট্যা"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

(শিল্প।)

[১] বস্ত্রশিল্প—[২] বেতের বুনন—[৩] নৌকাগঠনাদি।

শিল্পরচনায় চাকমাজাতি পশ্চাৎপদ নহে। বরং তন্নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে একটি উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে আমাদের রমণী-সমাজ নিদ্রালস্যে কিংবা 'নভেল' পাঠে কাল অতিবাহিত করেন, চাকমাগৃহিণী সেই সময়ে সাংসারিক অভাব পূরণে নিরত থাকে। দিনের বেলায় তাহাদের অবসর মাত্রই নাই। যদি গৃহকর্ম্ম সারিয়া যৎকিঞ্চিৎ অবকাশ লাভ হয়, তখন তাঁতখানি হইলেও লইয়া বসে। রাত্রিরও অধিকাশ ধরিয়া সূতা কাটা বা সূতার বীজ ছাড়াইতে ব্যস্ত থাকে। ইহাদিগের এতাদৃশ অশ্রান্ত কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে দয়া ও ভক্তি যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া তোলে! আমরা এই পাহাড়ীজীবনের আলোচনাকালে তৎপ্রতি বঙ্গীয় পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা আছে, ইহাদের হইতে তাঁহারা গৃহিণীপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শিল্পাসক্তি।

বর্ত্তমান সভ্যতার সংজ্ঞামতে যে জাতি যত অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভর, তাহাদের সভ্যতা গৌরবও তত বেশী! ইহাই শুধু সভ্যতার পরিমাপক হইলে চাকমাদিগকে অসভ্য বলিয়া ভ্রূকুঞ্চন কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের মধ্যে সূত্রধর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ইত্যাদিরূপে শ্রমবিভাগের দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক নাই। সুতরাং বংশমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে সকলেই শিল্পোন্নতি সাধনে সুবিধা পাইয়া থাকে। এমন কি ইহাতে ধনী নির্ধনের মধ্যেও কোন তারতম্য দেখা যায় না। ইহাও একটি গৌরবের কারণ বটে যে, চাকমাগণ কর্ত্তব্য সাধনকালে

শিল্প পরিমাপ।

স্বকীয় পদগৌরব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার অপরিসরতা নিবন্ধন ইহাদিগের শিল্প সাধনায়-এযাবৎ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা অতি সামান্য পরিমাণেই প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

এই পাহাড়ীদিগের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি কল্পে—অত্রত্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয়ের উদ্যোগপরায়ণতায় বিগত কয় বৎসর ধরিয়া "প্রদর্শনী" হইয়া (১) আসিতেছে। মাননীয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বার্ষিক ২০০৲ দুই শত টাকা করিয়া দিয়া উদারতার পরিচয় দিতেছেন। ইহাতে স্থানীয় রাজন্যবর্গও অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। রাঙামাটিতে এই "প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দুই দিন যাবৎ স্থায়ী থাকে। এ উপলক্ষে যাত্রা, সার্কাস, নৌকাচালান, দড়িটানা (Tug of war), দৌড় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেরও অভাব হয় না। পাহাড়ীরা তাহাদের প্রদর্শিত দ্রব্যের নিমিত্ত যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে তাহাদের প্রতিযোগিতা যেরূপ উন্নতিশালী হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, "প্রদর্শনী"র উদ্দেশ্য শীঘ্রই সুফলপ্রসূ হইবে। এই পুরস্কৃত লোকদিগের অধিকাংশই চাক্‌মা জাতীয়। গুণসাপেক্ষ বিচার হওয়াতে ইহারাই সমধিক লাভবান্ হইতেছে। তদ্দ্বারাও অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, অত্রত্য পাহাড়ীদিগের মধ্যে চাক্‌মাগণই কৃষি ও শিল্পে অপেক্ষাকৃত উন্নত।

শিল্পে সাহায্য।

[১]

প্রদর্শিত দ্রব্য সকলের মধ্যে ইহাদের বস্ত্রশিল্পই সাতিশয় উল্লেখ যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই এতৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীরই ইহা লইয়া ধীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। কিন্তু শত ধন্য চাক্‌মা মহিলায়, তাহারা লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া নাই। শুনিয়াছি, প্রথম বঙ্গে জড়াইবার বস্ত্র (খাদী) খানি প্রত্যেকের নিজেকেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কথাটা সত্য হইলে তাহাকে শিল্প-শিক্ষার এক মনোরম শাসন বলিতে হইবে।

শিল্পশাসন।

(১) The Industrial and Agricultural Exhibition.

এইরূপে প্রত্যেক চাকমা মহিলাই বস্ত্র বয়নে অল্পবিস্তর পারদর্শিনী; বয়ন শিল্প তাহাদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। (১)

ইহাদিগের (হাতের) তাঁতে বস্ত্র বয়ন একটু সময়সাপেক্ষ সত্য, কিন্তু তাহাতে এমনি মনোহর ফুল তোলা যায় যে, দেখিতে স্বতঃই প্রশংসা করিবার ইচ্ছা জন্মে! এই সকল তাঁতে মোটা সুতার কাজই ভাল চলে। পরন্তু ইহারা রেশমী বস্ত্র শিল্পেও সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতেছে। স্বর্গীয়া চাকমারাণী দয়াময়ীর স্বহস্ত নির্ম্মিত দুইখণ্ড রেশমী বস্ত্র "বোম্বাই প্রদর্শনী"তে কিরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উন্নতি।

অপর সকলের মধ্যে 'কাচালঙেরমুখ' নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ান এবং তদীয় শ্বশুর চেঙ্গীতীরবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের পরিবারেই অপেক্ষাকৃত পটুতা দেখা যায়,। সম্প্রতি শেষোক্ত মহোদয়ের অন্যতম জামাতা চেঙ্গীবাসী বাবু শশীমোহন দেওয়ান একখানি "ফ্লাইসাটেল্‌লুম্" আনিয়া স্বীয় বাড়ীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহার কাজ যে কিরূপ চলিতেছে, এযাবৎ সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহাদের হাত যখন অভ্যস্ত আছে, তখন সফলতা লাভে যে বহু বিলম্ব হইবে, বোধ হয় না। ইহারা সরুসুতা কাটিতে জানে না। সুতরাং অধিকাংশ কাপড়ের নিমিত্ত বিদেশজাত সুতা আমদানী হইয়া থাকে। এ সকল সুতা সাদাই আসে। পরে ইহারা প্রয়োজন মতে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষবল্লরীর নির্য্যাস দ্বারা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়। সচরাচর "কালাগাব" বৃক্ষের বল্কল জলে সিদ্ধ করিয়া কাল রং, তাহাতে কাল্‌মা যোগে নীলকৃষ্ণ, কার্ম্মাপাতা পঁচাইয়া চূণ মিশাইলে বা হল্‌দি ও আমগাছের ছাল দিয়া পীত, কাল্‌মা ও হল্‌দিতে সবুজ এবং 'রঙগাছের' শিকড় চূর্ণ ক্ষারের জলে মিশাইয়া লোহিত রঙ করিয়া লইয়া থাকে। এই সকল রঙকে পাকা করিতেও বনজপত্র বিশেষের রস ব্যবহৃত হয়।

বস্ত্রপরিচয়।

ইহাদিগের নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রশিল্পগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

"পিঁথন"—স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র। পূর্ব্বেও ইহার একরূপ পরিচয়

(১) শুনিতে পাই, পূর্ব্বকালে ইংরাজ-অর্দ্ধাঙ্গিণীগণও বস্ত্র বয়নে তৎপরা ছিলেন, তন্মূলক অংগ্রোসাক্সন "wifian" শব্দ হইতে ইংরাজী ওয়াইফ্ (wife) কথাটী আসিয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে কয়জন ইংরাজ-ললনা সার্থক ওয়াইফ্ (wife) সংজ্ঞার অধিকারী?

প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা লম্বে তিন হাত এবং প্রস্থে দুই হাত পরিমিত হইবে। বর্ণ গাঢ় নীল, মধ্যে প্রায় চারি অঙ্গুলী করিয়া বিস্তৃত লোহিত বর্ণের দুইটি সুদীর্ঘ ডোরা থাকে। ইহা প্রধানতঃ মোটা সুতাতেই প্রস্তুত হয়।

"খাদী"—বক্ষোবন্ধন বস্ত্র দৈর্ঘ্যে ২½ কি ৩ হাত, কিন্তু প্রস্থ এক ফুটের অনধিক। "খাদী" দুই জাতীয়—"রাঙা খাদী" ও "ফুল খাদী", "রাঙা খাদী"তে লাল সুতার কাজই বেশী, "ফুল খাদী"তে ফুল রচনাতেই অধিকতর মনোযোগ থাকে। ইহাতে "বাদই চোখ", "ত্রিপুরাউলু ফুল", "করঙা ফুল" প্রভৃতি নানা রকমের ফুল তোলা হয়।

"খবং"—পাগড়ী। ইহার সুতা সাদা, তবে যুবতীদের "খবং" প্রান্তে লোহিত-বর্ণ রঞ্জিত সুতার 'ফুল' তুলিয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাতেরও অধিক, প্রস্থ কোনরূপে এক হাত মাত্র হইতে পারে।

"কর্জ্জাল"—'ব্যাগ' (Bag) বা থলি বিশেষ। ইহা স্কন্ধোপরি হইতে উপবীত প্রায় ঝুলাইয়া লয়।

"পানের খল্যা"—ইহাকেও থলি বলা যায়; পান, সুপারী প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"গামছা খানি"—সচরাচর গা-মুছিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেও অনেক পুরুষ গরীব-দুঃখী ইহা পরিধানও করিয়া থাকে। ইহা নানা বর্ণেরই হয়। দীর্ঘ ৩ কি ৩½ হাত এবং প্রস্থ ১ কি ১½ হাত; কোন কোন "গামছা খানি"তে ফুল ও তোলা হয়।

"তৈইলা"—ইংরাজী towel শব্দেরঅপভ্রংশ। ইহা যে অনুকরণে আসিয়াছে, সহজে বুঝা যায়। এখনও সকলে এমন কি অধিকাংশ স্ত্রীলোকে ইহা প্রস্তুত করিতে জানে না। ইন্দ্রজয় ও রাজচন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যে তোয়ালে প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় বিলাতী 'তোয়েল'রই অনুরূপ। সম্ভবতঃ সর্ব্বাদৌ তাঁহাদের পরিবারেই এই অনুকরণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

"আলাম্"—ইংরাজী (chart) "চার্টের"ই অনুরূপ। ইহাতে হরেক রকমের ফুল লতাদির নমুনা রক্ষিত হয়। বস্ত্র বয়নকালে ইহা আদর্শরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"বর্গি।"—ইহা "গিলাপ" নামেও প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ বর্ণ ধবল, দুই দীর্ঘ ধারে লোহিত বর্ণের সামান্যরূপ পাইর। দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও প্রস্থে দুই হাতের দুই খানি কাপড় তৈয়ার করিয়া, উভয় খানিকে জোড়াইয়া চারি হস্ত পরিমাণ

বিস্তৃত করে। অনন্তর তাহাকে দুই ভাঁজ অর্থাৎ ৫ হাতে × ৪ হাতে করিয়া শীতের সময় গায়ে দেয়।

এতদ্ভিন্ন চাক্‌মারমণীর প্রস্তুত "ছিলুম" (কোর্ত্তা, এর কাপড়, বালিসের কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের চাদর, বিশেষতঃ দাবা-পাশা প্রভৃতি 'খেলার ঘরে' সুন্দর কারুকার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বয়ন প্রণালী।—তাঁত অপেক্ষাকৃত ছোট, স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয় বলিয়া প্রস্থে কোনরূপে দুই হস্তের অধিক নহে। কারণ, ইহাতে ও

তাহাদিগকে হেলিয়া ঢলিয়া মাকু চালাইতে হয়। তাঁত ঝুলাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোনও ঘর নাই। সচরাচর "ইজরে" বসিয়াই বস্ত্রবয়ন করিতে দেখা যায়। জুমের খন্দকালে জুমিয়া মহিলাগণ তাঁতের কাছে হাত দিতে পারে না। পরে অবসর মতে অর্থাৎ সাংসারিক নৈমিত্তিক কার্য্যাদি সারিয়া—যে সময়ে আমাদের বঙ্গমহিলাগণ নিদ্রাসুখসম্ভোগে কাটায়, তখন ইহারা তাঁত খানি লইয়া বসে। এইরূপে "পিঁধনের" মত এক খানি কাপড় তৈয়ার করিতে প্রায় মাসাধিককাল গত হয়। কিন্তু কাপড়ও এরূপ টেঁকসই হয় যে, দুই খানি "পিঁধনে" অবাধে দুই বৎসর কাটিয়া যায়।

টানাগুলির উভয় প্রান্ত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ থাকে, এক প্রান্ত "তাঘোয়া বাঁশে (১) আবদ্ধ করিয়া, বাঁশের উভয় দিক্ সম্মুখস্থিত কোনও স্তম্ভে বাঁধিয়া দেয়। অপর প্রান্ত "তাগলক্ ঘোড়ে" (২) আটকাইয়া দু'পাশে দুইখণ্ড রজ্জু মহিষচর্ম্মের "তাব্‌ছি" সহযোগে কটিদেশে টানাইয়া লয়। কর্কশ রজ্জুতে মেরুদণ্ডে ব্যথা লাগে, তাই এ চর্ম্ম "তাব্‌ছির" প্রয়োজন। টানাগুলির কতক উপরে, ও কতক নিম্নে থাকে, সেই ঊর্দ্ধাধঃ অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে "ব-কাঠি" (৩) ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কৌশলের সহিত সামান্য জোরে নাড়া দিলেই উপরের টানা নীচে এবং নীচের টানা উপরে চলিয়া আইসে। এতদ্ভিন্ন কাপড়ে যত অধিক ফুল তুলিতে হয়, "ব-কাঠি"ও তত অধিক প্রয়োজন। ফুলে বা লতায় প্রত্যেক রূপান্তরে এক একখানি "ব-কাঠি"র আবশ্যক হইয়া থাকে। "ব-কাঠি"র সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড "ছুচ্যাক্ বাঁশ" (৪)ও থাকে; তদ্বারা "ব-কাঠি" চাপিবার সুবিধা হয়। টানাগুলি যাহাতে ইতস্ততঃ সরিতে না পারে, তাই তৎসমুদয় "স্যয়ং" নামধেয় সরু বংশ খণ্ডে সুকৌশলে জড়িত থাকে। এইরূপে টানা সজ্জিত হইলে "থুব্‌চুঙা"য় (৫) পড়েন চালাইয়া "ব্যং" (৬) দ্বারা তাহা চাপিয়া দেয়। একটি পড়েন ফিরাইতে প্রথমতঃ "ব্যং" দ্বারা পূর্ব্ব বিন্যস্ত পড়েন চাপিয়া "ছুচ্যাক্ বাঁশে"র সাহায্যে "ব-কাঠি"র উপরের টানাগুলি নীচে এবং নীচের টানাগুলিকে উপরে তুলিয়া লয়, এবং "ব্যং"খানি সেই উন্মুক্ত পথে চালাইয়া পুনরায় চাপ দ্বারা পড়েনের স্থান অব্যাহত করে। অনন্তর "থুব্‌চুঙা" বিপরীতাভিমুখে চালাইলেই পড়েন পড়িয়া যায়। যদি কোনরূপে টানা বা

---

(১) "তাঘোয়া বাঁশ"—ইহা সাধারণ বংশখণ্ড মাত্র।

(২) "তাগলক্ ঘোড়"—বাঁশের দুই খানি বাখারী মাত্র। (৩) "ব-কাঠি"।—ব-অর্থাৎ সূত্র—কাঠি। সচরাচর এই "কাঠিতে" টানাগুলি একান্তরে জড়াইতে হয়। তবে ফুল-লতাদি তুলিতে "আলাম" দেখিয়া টানা জড়াইয়া থাকে। (৪) "ছুচ্যাক্ বাঁশ"।—ইহা প্রায় "তাঘোয়া বাঁশের"ই অনুরূপ; বিশেষত্ব মাত্র এই যে, ইহার এক প্রান্ত সুঁচালো। (৫) থুব্‌চুঙা—বংশ নির্ম্মিত মাকু। ইহা একটি এক প্রান্ত বদ্ধ সাধারণ 'চুঙা' বিশেষ। গাঁইট বিশিষ্ট প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সুঁচালো করা হয়। তা' ছাড়া চুঙার পার্শ্বে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। সূত্রনলী চুঙার মধ্যে ভরিয়া খোলা প্রান্তে ফুৎকার দিলেই উক্ত ছিদ্র দিয়া নলী হইতে সূত্র প্রান্ত বাহির হইয়া আসে। (৬) "ব্যং—একখানি মসৃণ ও ভারী বংশখণ্ড।

পড়েন সঙ্কুচিত বা জটিল বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সজারুকণ্টকের সাহায্যে তাহার শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। এই কাঁটার সাধারণ নাম—"কুহুক্-কাদা" (১)।

বস্ত্র বয়নের প্রধান কার্য্য—টানা এবং "ব-কাঠি" ঠিক করিয়া লওয়া। তা' না হয় "ব্যং" চাপন ও "থুরুচুঙা" চালনে কোন ও বিশেষ পারদর্শিতা নাই। পরন্তু একবার 'পড়েন' ফিরাইতে ইহাদের প্রায় ৩।৪ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, টানা বসাইবার পূর্ব্বে সূতাগুলি কলপে মাখিয়া লয়, অন্নমণ্ডই ইহাদিগের একমাত্র কলপ। এইরূপে—

"কার্পাসে কর্কশ বস্ত্র বুনে বিনোদিনী ;
সুবর্ণ অঙ্গুলিচয়
—কিন্তু কোমলতা ময়,—
নাচে তন্তু যন্ত্রে, (নীচে গায় কল্লোলিনী !)"

১০ম শ্লোক, "জুমিয়া জীবন।"

[২]

বুনন কার্য্যে পুরুষ চাকমা মাত্রেই প্রায় সিদ্ধহস্ত। তাহারা ঝুড়ি প্রভৃতি এত চিক্কণ ও পারদর্শিতা সহকারে প্রস্তুত করে যে দেখিয়া চোখ ফিরান কঠিন হয়। তবে এই সকল কার্য্যে বাঁশের চেঁচাড়ীরই প্রচলন অধিক। শীর্ষদেশে যদিও 'বেতের বুনন' সংজ্ঞা দেওয়া হইল, কিন্তু বেত অল্প কাজেই ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ বাঁশ অধিকতর সহজলভ্য বলিয়া বেতের প্রতি তাদৃশ নজর পড়ে না। এই পাহাড়ে এগার জাতীয় বাঁশ পাওয়া যায়। নাম যথা,—"এগজ্যা" "কার্ব্বোয়া" (পাইয়া), ওড়া, "মিদিঙা" (মিতিঙ্গাঁ), ডলু, "কালিছিরি", "ভুহম্," "নয়ানসুক," "লুদি" (লোথা), বারিয়ালা বা বাইরা, এবং কাঁটা বাইয়া। ইহার যে কোন বাঁশ দিয়া সকল কাজ করা যায় না। মিতিঙ্গাঁ, ডলু, ও লোথা বাঁশই ঝুড়ি নির্ম্মাণে বিশেষ উপযোগী ; তন্মধ্যে ডলু বাঁশেরই প্রচলন অধিক। এই বাঁশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ হাত এবং পরিধি ও ১৫।১৬ ইঞ্চি পরিমিত হইবে। নিম্নে এতদ্বারা প্রস্তুত ঝুড়িগুলির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) কুহুক—সজারু, কাদা—কাঁটা, অর্থাৎ সজারু কণ্টক। কেহ কেহ হরিণ শৃঙ্গ সূচ্যগ্র করিয়াও এনিমিত্ত ব্যবহার করে।

"ডুল"—আমাদের কথায় ডোল। ইহা এত বড়ও দেখা যায় যে, ৭।৮ মণ জিনিষ অনায়াসেই রাখা যাইতে পারে। "দিংরা"—ইহাতে সচরাচর ধান্যাদি শস্য রাখা হয়; আকারে ডোল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। "বারেং"—গঠন প্রণালী "দিংরার"ই অনুরূপ। ইহাকে ছোট "দিংরা" বলা যাইতে পারে। খুঁটা প্রভৃতি দিয়া বিশেষ কারুকার্য্যের সহিত প্রস্তুত হইলে ইহা "ফুলবারেং" নামে কথিত হয়। গহনা বস্ত্রাদি বহুমূল্য সামগ্রী ইহাতে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "বারেং" ও "ফুলবারেং" ইহাদের সিন্দুকের অভাব পূরণ করে। কাল্লোয়াং—সাধারণ "বারেং" এর সহিত তারতম্য অতি সামান্য মাত্র; কিন্তু ইহাদিগের নিত্য প্রয়োজনে আসে। খুঁটা চারিটী লাগাইয়া "পিঠাকাল্লোয়াং" প্রস্তুত করা হয়; বাজারাদিতে যাইবার সময় ইহা পৃষ্ঠের উপর দিয়া কপালের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইয়া থাকে। "কাল্লোয়াং" ভারী না হইলে, বিশেষতঃ সমতলভূমিতে চলিতে কপাল হইতে দড়িখানি স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে টানিয়া রাখে। আবার ভারী বোঝা লইয়া বেশী দূরে যাইতে হইলে "কাল্লোয়াং" এর সহিত দুই খানি "খিয়াম্" অর্থাৎ আঁকুড় বাঁধিয়া লয়; দুই স্কন্ধে "খিয়াম" দুইখানি দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে, সুতরাং কপালে জোর খুব কমই পড়ে। "কুরুং"—"কাল্যোরং" হইতেও অনেক ছোট এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছিদ্র। শস্য বপন কালে ইহাতে করিয়া বীজ লওয়া হয়।

ডলু বাঁশের কাজ।

সচ্ছিদ্র।

তৎপরে "মিতিয়াঁ বাঁশ"। ইহা ২০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং পরিধিও প্রায় ৯।১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। আকারেও গঠনে "পাইয়া বাঁশ" ও প্রায় একরূপ। কিন্তু "মিতিয়াঁ বাঁশে "পাইয়া বাঁশ" অপেক্ষা স্থিতি স্থাপকতা শক্তি অধিক, বেধ ও কিঞ্চিৎ বেশী হইবে। এই নিমিত্তই ছোটখাট ঝুড়ি সমুদয় "মিতিয়াঁ বাঁশে" নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কয়েকটীর বিবরণ যথা;—"পুল্যাং"—সেঁচনী বিশেষ, গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এতদতিরিক্ত "লুই" (১) এবং কুলা-চালুনি, ডুব ও নানাবিধ "চাই" (২) এই "মিতিয়াঁ বাঁশে" প্রস্তুত হয়।

"মিতিয়" বাঁশের কাজ।

(১) "লুইর" গঠনপ্রণালী সেঁচনীর ন্যায়, কিন্তু সারা গায়ে—জল সরিয়া পড়িতে পারে অথচ মাছ যাইতে না পারে এমন সব ছিদ্র আছে। জল সেঁচিয়া ইহাতে ফেলা হয়। সিঞ্চিত জলের সহিত যদি কোন মাছ যায়; তৎসমুদয় ইহাতে আবদ্ধ হইয়া যায়।

(২) মৎস্য ধরিবার কল বিশেষ, কোন কোন দেশে ইহাকে ঘুনী বলা হয়।

কিন্তু বুনন কার্য্যের পক্ষে "লোথা বাঁশই" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই বাঁশ সকলের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক এবং চেঁচাড়ি গুলিও বিশেষ মসৃণ হইয়া থাকে।

লোথা বাঁশের কাজ।

এই বাঁশের "ছাম্মো" অর্থাৎ বাক্সবিশেষ অতীব মনোহর। ইহার বাহিরে নানা কোণ এবং ভিতরে বিবিধ কক্ষ গঠিত করিয়া অশেষ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করা হয়। "কুম" অর্থাৎ কলসির ত্রিকোণ বিশিষ্ট ঢাক্‌নীও "লোথা বাঁশে" নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

বেতসও এই প্রদেশে অষ্টবিধ, যথা ;—"মরিজা," "চিকণ মরিজা", "গল্লাক", "কেরেৎ", "কর্কজ্যা", "বাঁদরী", "হুদুং" এবং "জ্যাং"। কিন্তু ঝুড়ি, ঝাঁপী প্রভৃতি বুনন কার্য্যে "গল্লাক", "বাঁদরী" ও "মরিজা"

বেতের কাজ।

—এই তিন রকমের বেত মাত্র ব্যবহারে আসে। বেতের কাজ তত অধিক নহে, পূর্ব্বোক্ত ঝুড়ি, ঝাঁপী ও ইহাদের মধ্যে বিরল প্রচলিত। তা'ছাড়া, ধান্যাদি শস্য মাপিবার আড়ি, সেরী, ছেলে দোলাইবার —দোলনা, এবং মৎস্য সংগ্রহের "তুলা" মাত্র সরচাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আড়ি, সেরী, "ফুলবারেং", "পিঠাকাল্লোয়াং" এর খুঁটিগুলি একমাত্র "গল্লাক" বেত দ্বারাই দেওয়া হইয়া থাকে।

* [৩]

নৌকা প্রস্তুত করাও ইহাদিগের জীবিকাসংস্থানের একতম উপায়। জুমের বপন ও বাছন কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সাধারণতঃ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই ইহারা নৌকা কাটিতে যায়; নদীস্রোত প্রবল থাকিতে থাকিতেই নামাইয়া লইয়া আসে। এই কার্য্যে পুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া সহধর্ম্মিনীগণকে ছাড়িয়া যায়! তাহারা "মইন ঘরে" থাকিয়া জুমক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে। বস্তুতঃ যৌথ-পরিবারেই নৌকা কাটিবার বেশ সুবিধা। তদ্ভিন্ন যে পরিবারে সামর্থ্যশালী একাধিক পুরুষ নাই, অন্যান্যকে তন্নিমিত্ত অংশীদার করিয়া লইতে হয়। ফলকথা, একজনের দ্বারা নৌকাকাটা কোনরকমেই চলে না। ইহাদের প্রস্তুত নৌকা কেবল যে চট্টগ্রামে মাত্র পশার লাভ করিয়াছে এমত নহে, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি দূর দেশেও বিস্তর সংখ্যায় রপ্তানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে অন্যত্য অন্যান্য সার্কেলের তুলনায় বোমাংসার্কেলেই নৌকা প্রস্তুত করিবার উপযোগী গাছ বেশী। চাকমা সার্কেলের মাইনিতে ও যথেষ্ট গাছ আছে, কিন্তু তৎসমস্ত এতদিন 'রিজার্ভ' ছিল বলিয়া পাওয়া যায় নাই।

তেলসুর, চাপালিস ও জারুল গাছের নৌকাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বিশেষতঃ

তেলসুর ও চাপালিস কাঠ ওজনে পাতলা এবং জলে বেশীদিন স্থায়ী হয়। এই দুই কাঠের শালতিরই প্রচলন অধিক। কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি দেশে প্রধানতঃ শালতিই রপ্তানী হইয়া থাকে। যদিও চাপালিস তেলসুরের সমান স্থায়ী নহে, কিন্তু প্রধানতঃ এই শ্রেণীর গাছ হইতেই আকারে বৃহত্তর নৌকা বা শালতি পাওয়া যায়। জারুল গাছ অত্যন্ত সুদৃঢ়, তাহার নৌকাও বৃহদায়তনে প্রস্তুত হইতে পারে, এমন কি ৩০ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ দেখা যায়। কিন্তু এই গাছের নৌকা গুরুত্বের আধিক্য নিবন্ধন বেশী চলেনা। কস্তুরী, কামদেব, ও গামার নৌকানির্ম্মাণের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাছ। এতদ্ভিন্ন করই, তালি, গুটগুটা, পিত্রাজ, গর্জ্জন, বৌলসুর, কাঁকড়া, ভাদী প্রভৃতি গাছের ও নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে ইহাদিগের নৌকাগঠনে একটি বিশেষ ত্রুটী আছে। একটি গাছ খোদিয়া ইহারা একখানি মাত্র নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহাতে যে কাঠ নষ্ট হয়, সেই পরিমিত কাঠে তক্তাচিরা নৌকার তিন-চারি খানি নির্ম্মিত হইতে পারে। এইরূপ তক্তা চিরিয়া নৌকা প্রস্তুত করিতে জানিলে, ইহাদের কাঠও শ্রমের যথেষ্ট লাভ হইত। কিন্তু কাষ্ঠশিল্পের আরও উন্নতি না হইলে সে আশা কোথায়!

নৌকার কাঠ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে ইহাদিগের "জাগল" ভিন্ন সচরাচর ব্যবহার্য্য বিশেষ কোন অস্ত্র ছিল না; একমাত্র "তাগল" দ্বারাই ইহারা যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। অধুনা ইহাদের মধ্যে নৌকাদি গঠনের নিমিত্ত কুরুল, "বাইস্" প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে। এই দুই অস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে গাছের মধ্যভাগ খোদিয়া লয়, অনন্তর "সামাতেইজং" (১) দ্বারা ছিদ্র করিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কাঠের একটি সরু কাঠি ঢুকাইয়া দেয়, এবং নৌকার অভীপ্সিতবেদ বাদ রাখিয়া বহির্ভাগ হইতে অবশিষ্টাংশ চাঁছিয়া ফেলে। অর্থাৎ যেন কোন ক্ষোদিত-বক্ষ কাষ্ঠখণ্ডের তলদেশে ছিদ্র করিয়া অষ্ট অঙ্গুলী পরিমিত একটি কাঠি ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। নৌকার বেদ রাখা হইবে—চারি অঙ্গুলী মাত্র। তাহা হইলে উক্ত কাষ্ঠখণ্ডের বহিঃপ্রদেশ এরূপ চাঁছিতে হইবে, যেন উক্ত কাঠির চারি অঙ্গুলী পরিমিত নৌকার পৃষ্ঠ-বহির্ভূত থাকে। পরে কাঠিটি খুলিয়া সেই ছিদ্র ভালরূপে আঁটিয়া দেওয়া হয়। অনেকে "সামাতেইজং"এর পরিবর্ত্তে "খোল বাটালী" ব্যবহার করে।

নৌকা খোদা।

(১) একপ্রকার 'রুরুল' বিশেষ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

[১]পশুপালন ; ও [২] শিকার।

[১]

পালনে পোষণ।

পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়, আদিমজাতি মাত্রেই পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ইহা আর্য্য ঋষিদিগের অতি পবিত্র কার্য্যরূপে পরিগণিত ছিল। বিশেষতঃ গো-সেবা হিন্দুদিগের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম! তাঁহারা গাভীকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি কোন কোন বাড়ীর কর্ত্তা গো-গৃহের কাজকর্ম্মসমূহ নিজে দেখিয়া পরে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পরিবারের আর সকলের ন্যায় গৃহপালিত পশুগুলি যেমন একদিকে আমাদিগের আশ্রিত ও পোষ্য, অপর দিকে তেমনি সর্ব্বথা যত্নের পাত্র! আমরা মনুষ্য বলিয়া যাদৃশ সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করি, এক্ষেত্রে তাহারই সম্যক্ পরীক্ষা প্রকাশ পায়। কিন্তু অত্রত্য পাহাড়ীগণ যে সকল পশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে, তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহারা তৎপ্রতি এত উদাসীন থাকে যে, অনেকে হয়ত বাড়ীতে কয়টি গরু বা কয়টি ছাগল আছে, তাহারও খবর রাখে না। গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি জঙ্গলে চরিয়া বেড়ায়, গৃহস্থ তৎসমুদয় রক্ষাতৎপর থাকিবে দূরে থাকুক, রাত্রিতে কয়টি ঘরে আসিল বা আসিল না, তাহাও একবার খুঁজিয়া দেখে না। অনেক গরু, মহিষ সপ্তাহের মধ্যেও দুই একবার ঘরে আসে না। গৃহস্থ কোনটিকে ২।৩ মাস যাবৎ বাড়ী ফিরিতে না দেখিলে বাঘে বা অন্য কিছুতে মারিয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। অধিকাংশ গৃহস্থেরই এই হতভাগ্য পশুগুলি থাকিবার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। উহাদের কোন কোনটি

মঞ্চের নিম্নে আশ্রয় লয়, অথবা অনাবৃত স্থানে ভূপ্রোথিত গোঁজে একত্রে দুই তিনটা আবদ্ধ হইয়া অদৃষ্ট ফল ভোগ করে। বর্ষাকালে দেখা যায়, এসকলের হাঁটু পর্য্যন্ত কাদায় ডুবিয়া আছে!

গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর, কুকুর প্রভৃতি চাক্‌মাদিগের সাধারণ গৃহপালিত পশু। গয়াল (বন্য গরু বিশেষ; ইহাদের দুগ্ধ অতিশয় গাঢ় ও সুমিষ্ট। জাল দিবার পূর্ব্বে জল মিশাইয়া লইতে হয়, নতুবা তলানি জমিয়া পুড়িয়া যায়! জর্ম্মাণ সম্রাট্ গো-জাতির উন্নতির নিমিত্ত ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুইটী সুপুষ্ট বৃষ লইয়া যাইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন। এখান হইতে আটটি গয়াল প্রেরিত হয়। শুনিয়াছি, পথে মরিতে মরিতে জর্ম্মানিতে দুইটি মাত্র পৌঁছিয়াছিল।) অতি অল্প পরিবারেই আশ্রয় পায়। কাপ্তেন লুইন বলেন, 'গরু ও মহিষ ফেণীতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। তত্রত্য অধিবাসিবর্গ বহু গোচারণ মাঠ হইতে পশুপালনের সাহায্য পাইয়া থাকে।' কিন্তু অনেক চাক্‌মা বাড়ীতেই গরু ও ছাগল পোষিত হয়; অবশ্য তাহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক হয় সন্দেহ নাই। মহিষের মূল্য অধিক বলিয়া সকলে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদিগের পশুপালন দুগ্ধপ্রাপ্তির নিমিত্ত নহে; পালিত পশুর বংশবৃদ্ধিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইতিপূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে যে, ইহাদের ঘরে অপর্য্যাপ্ত দুধ থাকিতেও অনেকে খাইতে চাহে না। দুধ বিক্রয় করিতেও সচরাচর দেখা যায় না; তবে সাধারণ গৃহস্থেরা দধি করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু বাজারের সুবিধা না থাকিলে তাহাও হইবার উপায় নাই। সম্পন্ন পরিবারের গরুর জন্য "উরা" থাকে; ইহার অন্য নাম "গোছাল শাল" অর্থাৎ গোয়াল। প্রত্যেকে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের অধিকার পাইলেও সেই "উরা" বাসী গরুগুলিকে অপরের তুলনায় সমধিক সৌভাগ্যশালী মনে করা যায়। কিন্তু মহিষকে গৃহে বাঁধিবার কোন পরিবারেই নিয়ম নাই। অধিকাংশ গৃহস্থই উহাদিগকে ভাবি সর্ষপক্ষেত্রে বাঁধিবার জন্য ব্যবস্থা করে। মহিষের বিষ্ঠা সরিষার প্রধান সার।

গরু, ছাগল ও মহিষ।

শূকর—প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। ইহা দুই জাতীয়—সাদা ও কাল। তন্মধ্যে কাল শূকরই সচরাচর অধিক। যতদিন ক্ষেতে কচু থাকে, ততদিন যাবৎ মোটা মোটা গাছের বেষ্টনে "গোরা" করিয়া, তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; অন্য সময়ে ছাড়িয়া দেয়। কেননা কচুর প্রতি শূকরের বড়ই লোভ; সুবিধা পাইলেই ক্ষেত্রে গিয়া সমূলে খায় ও নষ্ট করে। আরও একটা কথা, শূকর ও

মোরগ ইহাদিগের বাড়ীকে অপরিষ্কৃত হইতে দেয় না; নিজেরা যাহা কিছু দুর্গন্ধ করে মাত্র।

কুকুর—পাহাড়ী মাত্রেরই প্রধান সহচর। তাহাদের ধন সম্পত্তি এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ইহাদ্বারা রক্ষিত হয়। ইহার ভরসাতেই পাহাড়ীগণ এই ব্যাঘ্রভল্লুকাদি ভীষণ শ্বাপদপরিবৃত জঙ্গলে বাস করিতে সাহস পায়। এমনও দেখা গিয়াছে, কোন কোন গৃহস্থ কুকুরের উপর গো-চরণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সারমেয় প্রভু গো-পালের মধ্যস্থলে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতে থাকে; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেও পালের কাছছাড়া হয় না। যদি কোন বিপদ দেখিতে পায়, পূর্ব্বেই বিকৃত চীৎকার দ্বারা গরুগুলিকে সাবধান করিয়া দেয়; তাহাদের পলায়ন অসম্ভব বুঝিলে প্রাণান্তপণে পাল রক্ষার নিমিত্ত বিপদের সম্মুখীন হয়।

হরিণ—কোন কোন বাড়ীতে মাত্র কচিৎ পোষিতে দেখা যায়। কিন্তু সচরাচর পোষা হরিণ বড় হইলে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া থাকে। "ধনপাতা (একটি ছরা)র মুখ"-বাসী 'কাঙ্গার বাপ' আখ্যায় প্রসিদ্ধ জনৈক চাক্‌মা একটি হরিণী পোষিয়াছিল। সেইটি এত পোষ মানিয়াছে যে, জঙ্গল হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। বনের হরিণের সঙ্গে মিশিয়া গর্ভও হয়, তদ্দ্বারা সে এযাবৎ তিনটী শাবক পাইয়াছে। তা'ছাড়া কোন কোন কামোন্মত্ত হরিণ এই পোষিতা হরিণীর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। তাহাতেও সে ইতিমধ্যে দুইটি মারিয়া খাইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে একদিকে যেমন একপ্রকার চাষ চলিতেছে, অপরদিকে ফাঁদও মন্দ নহে!

এই সঙ্গে চাক্‌মাদিগের প্রতিপালিত পক্ষিগুলির বিবরণ সংক্ষেপরূপে হইলেও রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি, বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মোরগ ছোট বড় প্রায় সকল বাড়ীতেই আছে। মথুরাও কেহ কেহ পোষে বটে, কিন্তু বাঁচাইয়া রাখা অতিশয় কষ্টসাধ্য। হাঁসও খুব কম। এতদ্ভিন্ন সখের লালসায় পোষিত তোতা, ময়না, ধনেশ প্রভৃতি পক্ষীও কোন কোন বাড়ীর গৃহপ্রাঙ্গণে শোভা পাইয়া থাকে।

[২০]

অতঃপর শিকারের কথা! ইহা গণনার অতীত কাল হইতে আর্য্য ও অনার্য্য সকলেরই নিত্য কর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গস্বরূপে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে সভ্য বলিয়া যাহাদের গৌরব আছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এ মন্ত্রে দীক্ষিত। "একত্র কণিকা প্রীতি

শিকারনীতি।

অন্তেপ্র পৈর্ব্বিসূচ্যন্তে”—এ কেমন সভ্যতার নীতি, মনে করিলেও লজ্জা বোধ হয়! মধ্যযুগে যখন বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম্মদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” মন্ত্রের গম্ভীর নির্ঘোষে প্রাচ্য বক্ষ বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন এতদ্দেশে শান্তির এক বিমল প্রবাহ দেখা দিয়াছিল; কিন্তু তাহা আর রহিল কই? আবার সেই রুধিরপিপাসা বাড়িয়া উঠিয়াছে! সৃষ্টির প্রকৃষ্ট জীব মানব সম্প্রদায় তুচ্ছ শক্তিপ্রকাশ-ব্যপদেশে—অকিঞ্চিৎকর বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শোণিতধারায় পৃথিবীকে ঘোর কলুষিত করিতেছে!

শিকারাস্ত্র।

পূর্ব্বকালে পশুপক্ষিগণ মাত্র শিকারীদিগের লক্ষ্য ছিল। অধুনা সভ্যতার উন্নতিতে মনুষ্যনামধারী কতিপয় দুর্ব্বল নিরীহ জীবও ক্ষমতাদৃপ্ত মহাপুরুষগণের ব্যসনপিপাসা তৃপ্ত করিতে হতভাগ্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে! সুতরাং এহেন সভ্যতার যুগে (বুদ্ধ-বিশ্বাসী হইলেও) চাক্‌মাগণ যে, বন্য জন্তু হইতে প্রাণ ও ক্ষেত্রের শস্যাদি রক্ষার নিমিত্ত শিকারে পরাঙ্মুখ হইবে না, তাহাতে বিচিত্র কি? এজন্য বাল্যকাল হইতেই ইহারা শিকারে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কুমার বাহাদুরের শিকারনৈপুণ্যের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাকালে পক্ষীশিকারে “কামঠা-গুলি” এবং পশুশিকারে ‘তীরধনু’ ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি, কয়েকটি বালক “কাম্‌ঠা-গুলি”র সাহায্যেই কুকিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রচলন অতীব বিরল; বন্দুকের আমদানীই ইহার কারণ হইবে। তাহা ছাড়া “কাবুক” নামে ইহাদের অন্যতম এক অস্ত্র ছিল, তদ্দ্বারা ব্যাঘ্রাদি শিকার চলিত। ইহা সূচ্যগ্র বংশখণ্ডমাত্র। মাথায় বিষাক্ত দ্রব্য মাখিয়া বধার্হ পশুর চলাচলপথে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সহিত একখণ্ড অবনমিত বাখারীর যোগ করিয়া দেওয়া হইত। তাহা কোনরূপে নাড়া পড়িলে উক্ত “কাবুক্” বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আঘাতকারীকে বিদ্ধ করে এবং অচিরে প্রাণবিয়োগ ঘটায়! ইহাতে সময়ে সময়ে অনভিজ্ঞ পথিকেরও জীবন নাশ হইত। তাই সহৃদয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই “কাবুক” স্থাপনের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে মাত্র ফুঁরিয়া শূকর বধ করিবার নিমিত্তই “কাবুক্” ব্যবহৃত হয়। সে যাহা হউক, অধুনা একমাত্র বন্দুকের সাহায্যেই শিকার চলে। পূর্ব্বে এদেশে “লাইসেন্স” (License) ছিল না, কিন্তু ১৯০৩ ইংরাজিতে তাহাও প্রচলিত হইয়াছে; তজ্জন্য ইহাদিগকে বন্দুক প্রতি বার্ষিক চারি আনা করিয়া কর দিতে হয়।

শিকারের সময় ইহাদের বিশেষ সজ্জা "কর্জ্জাল" অর্থাৎ থলিবিশেষ মাত্র। তন্মধ্যে ছড়া, বারুদ, কেপ প্রভৃতি এমন কি ক্লান্তি অপনোদক পান-তামাকেরও যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণ করিয়া স্কন্ধোপরি ঝুলাইয়া লয়। সুতরাং তাহাতে শিকারীদিগের কোন অসুবিধা থাকে না। সঙ্গে থাকে প্রভুভক্ত সারমেয়। সে অধিকাংশ সময় সারথির কাজ করে, আগে আগে দৌড়িয়া সম্মুখীন অবস্থা পরিদর্শন করিয়া লয়। যদি কোন শিকারের সন্ধান পায়, নীরবে প্রভুসকাশে আসিয়া সঙ্কেত দেয়; অথবা বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে বিকট চীৎকারে প্রভুকে সাবধান করিয়া রক্ষা করিতে ধাইয়া আসে। এতাদৃশ বিশ্বস্ত শরীররক্ষক সঙ্গে থাকিলে শিকারীর আর ভয় কি!

সজ্জা ও সঙ্গী।

কোন কোন জাতির নিয়ম আছে, শিকারলব্ধ পশু বা পক্ষী প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে গলদেশ ছেদন করিয়া লয়। ইহাকেই বলা যায়, "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"! কিন্তু চাকমাদিগের তাহা নাই। বরং কেহ কেহ সেই শিকারাহত মুমূর্ষু জীবের ব্যাকুল কাতরতার মুখে জল দান করে; তাহা অবশ্য মন্দের ভাল, সন্দেহ নাই। আবার ইহাও বিরল নহে যে, অনেকে তাদৃশ ছট্‌ফটানিতে আমোদ উপভোগ করে। সাধারণ রায়তেরা যে সকল পশু শিকার করে, রাজসরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হেড্ ম্যানগণ সেই সব শিকারলব্ধ পশুর অংশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে একখানা করিয়া "রাণ" অর্থাৎ সমূল পদ দিতে হয়। হেড্‌ম্যানের বাড়ী দূরে হইলে তাহা শুকাইয়া রাখে; অতঃপর তাহাদের সত্বরতম অবকাশে দিয়া আসে। এতদ্ভিন্ন বড় পশু শিকারে তন্মাংস "লুটে" অর্থাৎ আদমের প্রত্যেক স্বতন্ত্র পরিবারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। খাজানা দিবার সময় যে সকল পরিবার স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, এস্থলেও তাহারা স্বতন্ত্র মাংসাংশ পাইয়া থাকে। এইত গেল পশুপক্ষী শিকারের বিবরণ, মৎস্যশিকারেও ইহারা বাঙ্গালীদিগের জাল, "চাই", বড়শী প্রভৃতি ধরিয়াছে।

শিকারের মাংস।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাপর সাধারণ ব্যবসায়।

সংসারে মানবের উপজীব্য নানাবিধ। অসংখ্য উপায়ে নির্ভর করিয়া পৃথিবীর লোক চলিতেছে। এমন কোনও সাধারণ পথ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহাতে সকলেই সেই পথে গিয়া সফল মনোরথ হইতে পারে। সুতরাং এসকলের মধ্যে কোন্ পন্থা যে প্রকৃষ্টতর তদবধারণও এক বিরাট সমস্যা। অধুনা অর্থকরী ব্যবসায় সমাজের সর্ব্বত্র সম্মানিত। যাহাতে অর্থের অনটন পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক লোকই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে কি অর্থই সংসারের সারসর্ব্বস্ব? অর্থ ভিন্ন পৃথিবীতে সাধনার বিষয় আর কিছুই কি নাই? তাহাইবা কিরূপে বলিতে পারি? যখন ধর্ম্মের ক্রিয়াগুলি অর্থের পৃষ্ঠোপরি পদাঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়, তদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিতেও ভরসা হয় না। ধর্ম্মের উপর অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যেমন সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, ধর্ম্মহীন অর্থ তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে নিকৃষ্ট ও ঘৃণনীয়। অতএব উপজীবিকার প্রধান লক্ষ্য এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে ধর্ম্ম ও অর্থের সাধনা অব্যাহত থাকিতে পায়।

উপজীব্য।

জীব মাত্রেই স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী। বনের পাখিটীও সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া রাজোপকরণ উপভোগেও অস্বচ্ছন্দ মনে করে। সুতরাং সভ্যতাদৃপ্ত মানবসমাজ স্বাধীন ব্যবসায় ভাল বাসিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এই আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানটুকু সকলেরই থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। "একান্ত বশংবদ ভৃত্য" জীবন কত যে দুর্ব্বিষহ, ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা অপরে অনুভব করিতে পারে না; দূর হইতে পরিষ্কার বাবুগিরির

বৃত্তি।

উজ্জ্বল দীপ্তিতে দিশাহারা হইয়া পতঙ্গ প্রায় আত্মসমর্পণ করে, আর তখন হইতে "চোখ বাঁধা বলদের মত, খেটে মরে অবিরত।" হায়! এহেন সুখের চাকরী লইয়া আবার তুমুল প্রতিযোগিতা! বস্তুতঃ চাকরিতে বিবেক শক্তিকে বলিদান করিতে হয়, নতুবা পদরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে। তাই নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।" আর হতভাগ্য বাঙ্গালী সেই চাকরী-পীড়িত ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া থাকে,—"চাকরী গু-খোরী না করি কি করি?" সম্প্রতিমাত্র স্বাধীনতাভ্রষ্ট চাকমা সমাজ এই আত্মসম্মানবর্জ্জিত চাকরিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহারা অনাহারে মরিলেও অন্যের চাকরী করিতে চাহে না। কাপ্তেন লুইন বলিয়া গিয়াছেন (১),—"১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু চাকমাদিগকে অধিক বেতন দিতে বলাতেও তাহারা মুজুরি স্বীকার করে নাই। অবশেষে গভর্ণমেণ্টকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চট্টগ্রাম হইতে কুলি আনিতে হইয়াছিল।" সে পুরাণো কথা কেন, বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে যখন ইহাদের অধিকাংশ অদৃষ্টের দারুণ নির্যাতন ভোগ করিতেছিল, স্ত্রী পুত্রের অনাহার-কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্ব্বহ জীবন ভার কমাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও ইহাদিগের অনেকে মুজুরি খাটিতে স্বীকার করে নাই। পোড়া উদর-জ্বালায় সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে, এমন কাহাকে যদি কোন সামান্য কাজ করিতেও বলা হইত, অমনি সে অভিমানিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিত। অধিক কি, একবার স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় এই অনশনক্লিষ্ট সাহায্যপ্রার্থিগণকে অগ্রিম টাকা দিয়া দৈনিক টাকা টাকা মুজুরিতে একখানি রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন; ইহারা তাহাতে সাহায্য প্রার্থনাও ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। যাহাহউক, এবারে শতকরা ৮।১০ জন লোকের মতি ফিরিয়াছে, দেখা গেল। তাহারা উপবাস কষ্ট আর সহিতে না পারিয়া প্রস্তরোৎপাটন, জঙ্গলকাটা, মোট বহন প্রভৃতি নানা কাজ করিয়াছে।

ইহাদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, 'মাংসাভ্যন্তরস্থ কণ্টক প্রায় আত্মীয়ের দাসত্ব অসহনীয়'—কথাটা অক্ষরে বর্ণে বর্ণে সত্য। চাকরী ও গোলামী কার্য্যতঃ এক হইলেও দায়িত্বে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। দগ্ধোদরকে কোনরূপে প্রবোধ

(১) The Hill Tracts of Chittagong and the dewellers therein— P. 35.

দিতে পারিলে চাকরির গঞ্জনা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু দাসত্ব খত হইতে রক্ষা পাওয়া পূর্ব্বে একরূপ অসম্ভব ছিল

দাসত্ব।

সহৃদয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ইহা এক মহীয়সী কীর্ত্তি,—যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অধীনতার কঠোর নিগড়মুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছে। সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায়, এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতেও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখের সেই বিধিমতে তিন শতাধিক অধমর্ণ দাস উদ্ধার পাইয়াছিল। ইহাতে চাক্‌মাদাসও যে ছিল না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই প্রথা যদিও সমাজের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণিত জ্ঞান হইত, তথাপি অভাবের তাড়নায় এবং চট্টগ্রাম বাসীদিগের অনুকরণে ইহারাও যে দাসত্ব অবলম্বন করে নাই, এমত নহে। চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা মিঃগুড্‌উইন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মাননীয় গর্ভণর জেনারাল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়,—তখন চট্টগ্রামে দাসত্ব প্রভাব বিলক্ষণ প্রবল ছিল। পিতৃমাতৃহীন এবং অপর সম্পর্কশূন্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অভাবে পড়িয়া আত্মবিক্রয়ে দাসত্ব গ্রহণ করিত। প্রভুদের আবার বিক্রয় ক্ষমতাও ছিল, ক্রেতা প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অধিকার পাইতেন। পক্ষান্তরে দাসপত্নী প্রভুপত্নীর চিরন্তন সহচারিণী হইত। এইরূপে পুরুষানুক্রমে এবংবিধ অধিকার ও অধীনতা অব্যাহত থাকিত। বলিতে কি, অদ্যাপি ইহার আভাব পরিদৃষ্ট হয়। আইন শাসনে যদিও দাস বিক্রয় রহিত, কিন্তু আত্মবিক্রয় এবং ভূমির কর মুক্তিতে দাসপণা বিরল নহে। (১) চট্টগ্রামের তাদৃশী ব্যবস্থা ইহাদিগের উপরও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। তবে এই দাসত্ব প্রথায় কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ স্থলে ঋণের দায়ে দাসত্ব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। নিরুপায় অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে; নির্দ্দিষ্ট বেতন হইতে সুদ বাদ গিয়া ক্রমে মূলধন পরিশোধ হইতে থাকে। কেহ কেহ বা সন্তান কি পরিবারের অপর কাহাকেও উত্তমর্ণের গৃহে রাখে; বলা বাহুল্য, ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে ইহাদের দাসত্বদায় ঘুচিয়া যায়। বেতনভোগী চাকর অপেক্ষা ইহাদের উপর কাজকর্ম্মে দায়িত্ব ভার কম থাকে এবং ইহারাও পরিবারস্থ লোকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; কোনরূপ কর্কশাচরণ

(১) আইনের নজিরে দেখা যায়, পূজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গগত হরগোবিন্দ রাহাই চট্টগ্রামের বর্ত্তমান "চাকুরাণ" ব্যবস্থার কারণ। গোলামেরা মুক্তিকামনায় যে অভিযোগ করে, তিনি তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

পরিলক্ষিত হয় না। জাতীয় বিচারের অর্থদণ্ড শোধে অসমর্থ ব্যক্তিও বিচারকের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা ক্রমে পরিশোধ করিয়া দিয়া থাকে।

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষায় চাকরিই আমাদের অনন্তগতি। তাই চাকমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও প্রায় বাঙ্গালীদিগেরই মত সেই পুরুষপরম্পরাঘৃণিত চাকরী-লোলুপ হইয়াছেন। তবে কিনা তাঁহারা এযাবৎ রাজকর্ম্ম ছাড়া অপর কোন সাধারণ কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। মাননীয় গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আনুকূল্য দেখাইয়া আসিতেছেন। তাহারই ফলে—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান উভয়েই সবডেপুটি কলেক্টরের এবং জামাতা বাবু অবিনাশ-চন্দ্র দেওয়ান স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টরের পদ লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাবু জিজগৎ দেওয়ান স্থানীয় ট্রেজারীর খাজাঞ্চী, বাবু শশীকুমার দেওয়ান, বাবু শরচ্চন্দ্র দেওয়ান ও বাবু ভগবানচন্দ্র দেওয়ান পুলিস সব্ ইন্‌স্পেক্টর; শ্রীমান্ মদনমোহন দেওয়ান—হস্‌পিটাল এসিঃ, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার সুপাঃ অফিসের অন্যতম কেরাণী, বাবু লালমণি চাকমা ভেক্সিনেসন সব্ ইন্‌স্পেক্টর, শ্রীমান্ রাজচন্দ্র চাকমা শ্রীমান্ শম্ভুমণি চাকমা রাইটার কন্‌ষ্টাবলে কার্য্যে আছেন। শুনিতেছি, স্থানীয় বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হাচিন্সন মহোদয় ইঁহাদিগকে আরও অধিকতর পরিমাণে রাজকর্ম্মে প্রবেশাধিকার দিতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যদিকে রাজবাহাদুরের আফিসেও বাবু মধুচন্দ্র দেওয়ান ইংলিস ক্লার্কের কার্য্যে আছেন।

কর্ম্মচারী।

সমগ্র চাকমা সমাজের তুলনায় এইরূপ চাকুরের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই বলিয়া আর আর সকলে কেবল আত্মাভিমানের মদগর্ব্বে বসিয়া নাই। স্বাধীনতাস্পৃহা আত্মনির্ভরতাকে উত্তেজিত করে, নতুবা উদর নামক বৃহৎ গহ্বরটির পূর্ত্তি চলিবে কিরূপে? পরন্তু জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষ প্রায় সমভাবে চেষ্টা করে; উভয়েই উভয়ের সহচর ও সাহায্যকারী। নিতান্ত অসমর্থ ভিন্ন কেহই অপরের গলগ্রহ হইতে চাহে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা বাহিরের কাজে পুরুষদের সমান পরিশ্রম করিয়াও সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্ম অনন্য-অপেক্ষায় সম্পাদন করিয়া থাকে। তদুপরি পতিসেবা, সন্তান পালন, অতিথি সৎকার ইত্যাদি আরও কত আছে! চাকমামহিলার এই অপূর্ব্ব মহত্ত্ব বার বার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, আরও শত—সহস্র বার বলিয়া গেলেও যেন বলা ফুরাইবে না! বাস্তবিক ইহা অপর সাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধার্হ এবং বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

বিগত (১৯০১ সালের) আদমসুমারিতে দেখা যায়, ইহাদিগের ১৪৮৭৩ জন পুরুষ এবং ১২৮৮১ জন স্ত্রীলোক নিয়মিতরূপে খাটিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে।

বিভিন্ন শ্রম।

তন্মধ্যে ১৪৭৭২ জন পুরুষ ও ১২৭৮৯ জন স্ত্রীলোক কৃষিকার্য্যে, ৮ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোক শিক্ষাদান কার্য্যে এবং ২৬ জন পুরুষ শাসনসম্বন্ধীয় কর্ম্মে লিপ্ত ; অবশিষ্ট ৯০ জন পুরুষ ও ৬৭ জন স্ত্রীলোক ছোট বড় নানা কাজ লইয়া আছে। সুতরাং সমুদয় জাতির মধ্যে আর ২১৯৬৪ জন বালবৃদ্ধবনিতা মাত্র সম্প্রতি অকর্ম্মণ্য।

বস্তুতঃ শাসন, কৃষি, শিল্প, যজন, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিকার, চাকরী, পশুপালন ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ই চাক্‌মাদিগের সাধারণ উপজীব্য। তবে ইহাদের সমাজে উপরোক্ত ব্যবসায়গুলির মধ্যে যথাসন্নিহিত পরবর্ত্তী হইতে ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অধিকতর সম্মানজনক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়গত শ্রমবিভাগ নাই। সুতরাং যাহার যে কর্ম্মে অভিরুচি এবং দক্ষতা আছে, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে তাহা সে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে। কেবল শাসনসম্বন্ধীয় কার্য্যের নির্ব্বাচনভার মাত্র অধুনা গভর্ণমেণ্টের হস্তে রাখিয়াছেন, তাহাও আবার উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে। গ্রামবাসী যাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এবং রাজাভিমতও তদনুকূল হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই তৎপদ প্রদান করেন। যজন, চিকিৎসা এবং চাকরীও কথঞ্চিৎ পরিমাণে সেরূপ উপযুক্ততা-সাপেক্ষ ; অপর দিকে কৃষি, শিল্প, শিকার, পশুপালন প্রায় সকল পরিবারেই আছে। কেবল বানিজ্যে মাত্র ইহাদিগের আসক্তি আশানুরূপ নহে। হায়! যে উপায়ে বিদেশীয়গণ আসিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সপরিবারে অহর্নিশি অবিশ্রান্ত খাটিয়াও যাহার করাল আক্রমণে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে, তৎপ্রতি সমুচিত দৃষ্টিনিক্ষেপে অদ্যাপি তাহারা উদাসীন!

নানা পন্থা।

এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বৎসর একমাত্র চাক্‌মাদিগেরই শ্রমলব্ধ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার কার্পাস, তিল, অরণ্যজাত কাষ্ঠ, নৌকা, বেত, হুন ও আলানী কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু বলিতে কি, বিদেশীয় মহাজনেরা দাদন খাটাইয়া তাহা হইতেও প্রায় তৃতীয়াংশ আত্মসাৎ করে। তাহা ছাড়া এ সকল দ্রব্য চট্টগ্রামে অর্থাৎ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমা ছাড়াইলেই প্রায় দেড়গুণ মূল্য ধারণ করে, চট্টগ্রাম

বাণিজ্য।

পৌঁছিতে পৌঁছিতে আরও বেশী হয়। পরন্তু এই লভ্যাংশের সিকি পয়সাটিও ইহাদিগের ভাগ্যে ঘটে না;—সমস্তই বিদেশীয়দিগের সিন্দুকজাত হয়। কিছুকাল হইতে কুমার রমণীমোহন কার্পাস ও তিলের ব্যবসায় খুলিয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানাভাবে তেমন সুবিধা হইতেছে না। সবডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দেওয়ান ও রাইখ্যং বাজারে একখানি দোকান খুলিয়াছিলেন; সুবিধামুরূপ চালাইতে না পারায়, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এতদ্ভিন্ন আরও দু'চারিজন বেপারী দেখা যায় বটে, কিন্তু এই বিরাটজাতির পক্ষে এতৎসমুদয়কে নিতান্ত অগণ্য বলিলেও চলে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যের প্রতি আরও দু'একজনের আন্তরিক অনুরাগ দেখা যায়। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে তাঁহারা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। যদি ধনশালী মহোদয়গণ তাঁহাদিগকে সামান্য অংশমাত্র দিয়া হইলেও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা ঘটিতে পারে।

সচরাচর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকরী ইত্যাদিতে একটি সাধারণ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ সমুদয় সম্বন্ধে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমস্তের ব্যাপক-আলোচনা স্বরূপে বলা যাইতে পারে, জুম নিতান্ত দরিদ্রশ্রেণীরই অবলম্ব্য। সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়—মোটকথা উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলে সকলেই লাঙ্গলের চাষ আরম্ভ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ এই দল হইতেই অধিক পরিমাণে লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং চাকরীওয়ালার সংখ্যাও এই দলে অধিক। আর গরীব জুমিয়াগণ অভাবে পড়িয়া নানা প্রকার বেতের কাজ, নৌকাগঠন প্রভৃতি দ্বারা এবং বনজাত উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ, জালানী কাঠ ও ছন ইত্যাদি কাটিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহে বাধ্য হয়। এই সমস্ত এবং জুমোৎপন্ন অপরাপর দ্রব্যনিচয় তাহারা নিকটবর্ত্তী বাজারে নিয়া বিক্রয় করে। ইহাই তাহাদিগের একমাত্র অন্তর্বাণিজ্য। সুতরাং জুমিয়াদিগের দ্বারাই শিল্প ও বাণিজ্যকার্য্য প্রধানতঃ চলিয়া থাকে। তাহা না হইয়াও উপায় নাই; যখন নৌকাগঠনাদির সময় আসে, তখন চাষাদিগের অবকাশ মাত্রই থাকে না। কিন্তু বস্ত্রবয়নের ভার উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীসমাজের উপরই ন্যস্ত রাখিয়াছে। পশুপালন চাষাদিগেরই অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের অন্তর্গত। সাধারণ—মোরগ, শূকর ইত্যাদি ভিন্ন চিরপরিবর্ত্তনশীল জুমিয়াদিগের অপর পশুপালন পোষায় না। তবে শিকারে চাষাগণ হইতে জুমিয়াদিগের অধিক প্রয়োজন হয় বটে। এতদ্ভিন্ন যখন কাজও শেষোক্তদলের অধিকারে অধিক।

ব্যবসায়ে সাধারণ সূত্র।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

[১] শিক্ষা (—স্ত্রীশিক্ষা);

এবং

[২] ভাষা—বর্ণাবলী—অপরাপর ভাষার সহিত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ।

[১]

অবশ্যই ইহা স্বীকার্য্য যে, শিক্ষায় চাক্‌মাজাতি অদ্যাপি বহু পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সরকারী কাগজপত্রে (১) পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় অর্দ্ধলক্ষ অধিবাসীমধ্যে ২১৫৬ জন পুরুষ এবং ৪৪ জন স্ত্রীলোক মাত্র শিক্ষিত। তন্মধ্যে ৭৮৮ জন পুরুষ ও ২৪ জন স্ত্রীলোক বাঙ্গালা, আর ৫৫ জন পুরুষ মাত্র ইংরাজী জানে। অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা চাক্‌মাভাষা লিখিতে পড়িতে পারে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষিতদিগের মধ্যে ২৯০ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক চাক্‌মা লেখাপড়াতেও পরিপক্ক, এবং ১২ জন পুরুষের মগভাষাতে অভিজ্ঞতা আছে। এক কথায় শত-করা ৪৷৷০ জন মাত্র কোনরূপে শিক্ষিত সংজ্ঞালাভের যোগ্য। এখনও অনেকেই লেখাপড়ার উপযোগিতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; তাই ইহাদের সমাজে জ্ঞান-জ্যোতিঃ এতই ক্ষীণ! সাধারণ সকলে স্থূল দৃষ্টিতে আলোচনা করে, লেখাপড়া শিখিলে বিলাসিতা আসে, সাংসারিক কাজকর্ম্মে অভিজ্ঞতা জন্মে না, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের যাহা কিছু উপায়—তাহাও অতি ঘৃণার্হ। একেত চাকরী—তাও আবার বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া (২)! ফলে বর্ত্তমানে যাহাদের মন

শিক্ষার পরিমাণ।

(১) Cencus Report—1901 &c.

(২) রামকমলবাবু একবার জনৈক চাক্‌মাকে বিদ্যার উপযোগিতা বুঝাইতে গিয়া বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল, 'মাষ্টার, তুমিও ত লেখাপড়া শিখিয়াছ, তার ফলে স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িয়া এই বিদেশে বিদেশে ঘুরিতেছ। আমার ছেলে লেখাপড়া শিখিলে তাহার

শিক্ষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকে পাঠশালায় শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া থাকে।

অতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, সহৃদয় ইংরাজগভর্ণমেণ্ট এপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অবধি এই পার্ব্বত্য জাতিসমূহের শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর অনুগ্রহ দেখাইতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত সরকারী রাজস্ব হইতেই একখানি মধ্য ইংরাজী স্কুল, চারিখানি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৭৭ খানি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১) সাহায্য প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় সাড়েবার হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এ সমুদয়ের কোন স্কুল হইতেই ছাত্রবেতন লওয়া হয় না, ফলতঃ গভর্ণমেণ্টের অভীপ্সিত অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের সঙ্কল্প এদেশেই বহুকাল হইতে কার্য্যকরী হইতেছে। এতদ্ভিন্ন খাস গভর্ণমেণ্টেরই সম্যক্ পরিচালনাধীনে রাঙামাটিতে এক উচ্চ ইংরাজী স্কুল (২) চলিতেছে, তাহাতে

সুবিধা।

অবস্থাও ত এইরূপ হইবে? হায়—লেখাপড়ার এই ত পরিণতি।' বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার পরিণাম যে চাকুরি—তাহাতে জীবনধারণ ভারস্বরূপ নহে কি?

(১) এই জেলায় মোট প্রাইমারী স্কুল সংখ্যা বালকের—৯০, এবং বালিকার—২; তা'ছাড়া ২৩ খানি ক্যাংস্কুল এবং ৪ খানি মক্তবও আছে। এই শিক্ষা বিস্তৃতির মূলে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব সিভিলসার্জ্জন ও শিক্ষাবিভাগের অবৈতনিক সেক্রেটরী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সাহা এবং অন্যত্র স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর পরলোকগত গগনচন্দ্র বড়ুয়া—মহোদয়দ্বয়ের চেষ্টা সাতিশয় প্রশংসার্হ। সম্প্রতি প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান সবইন্‌স্পেক্টারের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন, আশা করা যায়—তাঁহাদ্বারা দেশের অধিকতর উন্নতি হইবে।

(২) এই স্কুল প্রথমতঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রঘোনায় স্থাপিত হয়। তখন ইহার "চন্দ্রঘোনা বোর্ডিংস্কুল"—আখ্যা ছিল। ইহাতে দুইজন মাত্র শিক্ষক ছিলেন, ছাত্রগণও মাত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অনন্তর সমগ্র স্কুল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগের শ্রেণীগুলির নাম হইল "বার্ম্মিজ ক্লাস", অন্য ভাগের শ্রেণীগুলির নাম হইল "চাকমা ক্লাস"। বার্ম্মিজ ক্লাসে—বার্ম্মিজ, ইংরাজী ও বাঙ্গালা বা বার্ম্মিজ ও বাঙ্গালা পড়ান হইত, এবং চাকমা ক্লাসে—বাঙ্গালা ও ইংরাজী অথবা কেবল বাঙ্গালা অধ্যাপনা চলিত। অনন্তর ১৮৬৯ অব্দের প্রারম্ভেই ডেপুটি কমিশনার অফিস চন্দ্রঘোনা হইতে রাঙামাটিতে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্কুলও চলিয়া আইসে; তখন হইতে ইহা "রাঙামাটি গভর্ণমেণ্ট বোর্ডিংস্কুল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ইহাতে মধ্য ইংরাজী শ্রেণী খোলা হয়। তাহাতে ১৯ জন মধ্য ইংরাজী, ৪ জন মধ্যবাঙ্গলা এবং ৪০ জন উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে

পাহাড়ী ছাত্রগণকে উল্লিখিতরূপ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যতীত পঞ্চাশ জন ছাত্রকে স্বচ্ছন্দরূপ আহার পর্য্যন্ত দেওয়া হয়; এবং নিতান্ত দরিদ্রদিগের পুস্তকের জন্যও কিছু টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। সম্প্রতি আবার প্রথম চারি শ্রেণীতে অধ্যয়নপর দরিদ্র ছাত্রদিগের নিমিত্ত দুই ও তিন টাকার দুই দুইটি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ডাক্তারের বন্দোবস্ত আছে, এবং প্রধান শিক্ষক ও অন্যতম সহকারী শিক্ষকের উপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভার ন্যস্ত। বোর্ডিংএ পাচক, ভিস্তি, মেথর প্রভৃতিও যথানিয়মে আছে, এমন কি তাহাদের বস্ত্রাদি পরিষ্করণের নিমিত্ত সরকার হইতে একজন ধোপাও নিযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের জল খাবার এবং পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত দেওয়া হইত, কয়েক বৎসর হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন বিভাগীয় কমিশনার কি উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী স্কুল পরিদর্শনে আসিতেন, তখন শিক্ষার ইহাদের আসক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত থলে খুলিয়া 'হরিলুটের বাতাসা'র ন্যায় টাকা ছড়াইতেন। আর বালকগণ হুড়াহুড়ি করিয়া তৎসমুদয় লুটিতে দেখিলে, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া হাততালি দিতেন!

হায়! এত সুবিধা ও প্রলোভন সত্ত্বেও ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত নাকি পূর্ব্বতন শিক্ষকগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। তাঁহারা এই দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রান্বেষণ করিতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহারা "ছেলেধরার" লোক (১) বলিয়া বিপদেও পড়িতেন। এই কারণেই একবার কতিপয় দুষ্টলোক ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয়ের নৌকা ডুবাইয়া দেয়, তিনি অতি কষ্টে প্রাণে প্রাণে ফিরিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ইহাতেই তাঁহার সেই উদ্যম ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহারই ঐকান্তিক অধ্যবসায় বলে এই স্কুলের বর্ত্তমান উন্নতি ঘটিয়াছে। অধুনা অবশ্য তেমন দ্বারে দ্বারে ছাত্রসংগ্রহ

ছাত্রধরা।

ইহাকে উচ্চ ইংরাজীতে উন্নীত করিয়াছেন। এযাবৎ ইহাতে ১২ জন পাহাড়ী এবং ২৬ জন বাঙ্গালী ছাত্র প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার কর্ম্মচারীসংখ্যা অত্যল্প মাত্র ছিল। বর্ত্তমানে শিক্ষক ১১ জন, দপ্তরী ১, দারোয়ান ১, মালী ১, মেথর ১ হইয়াছে। ১৯০৮—০৯ অব্দে গভর্ণমেণ্টের স্কুলের জন্য ৭১৭৫৲ এবং বোর্ডিংএর জন্য ২৭২৯৲ টাকা ব্যয় গিয়াছে; তন্মধ্যে ৪২৯৲ টাকা মাত্র ছাত্রবেতন আদায় হইয়াছে।

(১) পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কাহাকেও সুবিধা মত পাইলে, ধরিয়া নিয়া তাহাদের দলভুক্ত করিত, তাহারাই "ছেলেধরা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

করিতে যাইতে হয় না বটে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আগ্রহানুরূপ ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না। ফলতঃ শিক্ষার উন্নতি যাদৃশ মন্দ, তাহাতে মনে হয়—আরও বহুদিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্টকে এই বোর্ডিং ব্যয় বহন করিতে হইবে।

এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে খৃষ্টিয়ান মিশনারীগণের চেষ্টাও অবশ্য উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারাও স্থানে স্থানে বোর্ডিং পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, এবং রাঙামাটিতেই বোর্ডিংযুক্ত এক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় রাখিয়াছেন। উপসংহারভাগে তাঁহাদের অধ্যবসায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সে যাহা হউক, তাঁহাদিগের সেই উৎকট ধর্ম্মবিস্তার চেষ্টাও এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের কম অনুকূল নহে। ফলতঃ পার্ব্বত্য যুবকদিগের শিক্ষানুরাগবর্দ্ধনের জন্য এই সমুদয়ই যথেষ্ট নহে. সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এই জেলার মধ্য পরীক্ষায় ১টী, উচ্চপ্রাথমিকে ২টী ও নিম্ন প্রাথমিকে ৮টী বৃত্তি প্রদান করিতেছেন এবং কেবল এই রাঙামাটি স্কুলেরই নিমিত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকার এক বৃত্তি রাখিয়াছেন এবং উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়নার্থিকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কুমার রমণী বাবু প্রতিবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রথম পাহাড়ী ছাত্রকে "সৈরিন্ধ্রী মেডেল" নামে এক রৌপ্যপদক দিতেছিলেন, সম্প্রতি তৎপরিবর্ত্তে প্রবেশিকায় উক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত চাক্‌মা ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ দুই বৎসর স্থায়ী মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবং ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯১৭ ইংরাজীর মধ্যে যে চাক্‌মাছাত্র সর্ব্বপ্রথমে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তিনি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দান করিবেন।

পুরস্কার।

এতসব চেষ্টার ফল নিতান্ত সামান্য হইলেও এবং মঘ, কুকি, মুরং, ত্রিপুরা, বনজুগী প্রভৃতি সকলের প্রতি গভর্ণমেণ্টের তুল্যদৃষ্টি থাকিলেও পাহাড়ীদিগের মধ্যে চাক্‌মাগণই শিক্ষায় সর্ব্বাধিক অগ্রসর হইয়াছে। কি পাঠশালায়—কি স্কুলে অধিকাংশই চাক্‌মা ছাত্র। অপরাপর পাহাড়ী ছাত্রের তুলনায় চাক্‌মাছাত্র অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই শিক্ষারম্ভ করে। বর্ত্তমানে কেবল চাক্‌মা পল্লিতে দুইখানি উচ্চপ্রাথমিক এবং ৩২ খানি নিম্নপ্রাইমারী বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ৫২৬ জন চাক্‌মাছাত্র শিক্ষা-লাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অধুনা অন্যান্য স্থানে অধ্যয়ন নিরত চাক্‌মা ছাত্র সংখ্যাও প্রায় শত সংখ্যক হইবে। অপরদিকে দেখা যায়, রাঙামাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গত দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র ৯৪ জন চাক্‌মা ছাত্র ভর্ত্তি

ফল।

হইয়াছে; সুতরাং বার্ষিক দশ জনও নহে। পার্ব্বত্য অপরাপর জাতির তুলনায় ইহাদিগের শিক্ষা শক্তি যদিও ন্যূন নয়, কিন্তু বিরাট সমাজের গণনায় উহা নিতান্ত সামান্য বলিতে হইবে। পরীক্ষা ফলও তাদৃশ সন্তোষপ্রদ নহে। এযাবৎ ইহাদের হইতে নিম্ন প্রাইমারীতে ৬৮ জন, উচ্চ প্রাইমারীতে ৮ জন, এবং মধ্য পরীক্ষায় ৩ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। উচ্চশিক্ষার ফল ততোধিক শোচনীয়। মাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান্ই বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি ছাড়া বর্ত্তমান রাজা ও কুমার—ভ্রাতৃযুগল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেওয়ান ও শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার, ফার্ষ্ট আর্ট পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, নবকুমার দেওয়ান নামে আর একটি ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশের সংবাদ বাহির না হইতেই করালকাল হতভাগ্যকে ইহলোক হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহারই সমপাঠী শ্রীমান্ মদনমোহন দেওয়ান প্রবেশিকা পাশের পর কেম্বেল স্কুল হইতে হস্পিটাল এসিষ্টাণ্টসিপ্ পাশ করিয়া আসিয়াছেন। অবশিষ্ট শ্রীমান্ যামিনীকুমার দেওয়ান ও শ্রীমান মতিলাল চাকমা এই বৎসরে উত্তীর্ণ। এতাদৃশী উন্নতি কোন জাতীয়-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয় সত্য, তবে সুখের ও আশার কথা এই, ক্রমেই ইহা বিস্তৃত হইতেছে। বিশেষতঃ গত কয়েকবৎসর ধরিয়া ইহা যেরূপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে কালে ইহার প্রভূত উন্নতি আশা করা যায়।

এস্থলে একবার স্ত্রীশিক্ষার আলোচনাটুকু করিয়া রাখা মন্দ নহে। এই সভ্যতাদৃপ্ত বিংশ শতাব্দীতে ইহার উপযোগিতা প্রায় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নিতান্ত অসুবিধা বিশেষ না থাকিলে অধুনা স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদানে কাহাকেও বিমুখ দেখা যায় না। বস্তুতঃ অর্দ্ধাঙ্গ লইয়া সমাজ কত আর অগ্রসর হইতে পারে? গৃহিণীকে দিয়া যদি পারিবারিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মগুলিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা না যায়, তবে আর সে পরিবারে সুখ কোথায়। শিক্ষা না পাইলে বাহ্য জ্ঞান লাভেরও সুবিধা পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহাদের হৃদয়ে শিক্ষাদীপ প্রজ্জ্বলিত নহে, তাহাদিগের দ্বারা পারিবারিক সুখের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমানে অবরোধ পালিতা বঙ্গীয় ললনাগণ শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। সম্ভ্রান্ত চাকমাগণও তদনুকরণে নিজেদের পরিবার গঠনে চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিগত আদমসুমারিতে ৪৪ জন শিক্ষিতা চাকমা রমণীর খবর পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ২৪ জন বাঙ্গালা এবং ২০ জন চাকমা লেখা পড়ায়

স্ত্রী-শিক্ষা।

অভিজ্ঞ। ইহাদের মধ্যে চারিজনের উভয়বিধ লেখা পড়াতেই পরিপক্কতা আছে। যতদূর দেখা যায়, এতদুৎসাহদাতৃগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় দেওয়ানই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার দুইটী কন্যাই শিক্ষিতা। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ষোড়শীবালা প্রথম বিভাগে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশের পর উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য শেষ করিয়াছেন। ইহারা ছাড়া শ্রীযুক্ত পূর্ণ দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী উচ্চপ্রাথমিকের পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। অপর শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী ইন্দ্রানী ও শ্রীমতী সুরবালা, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী এবং সব ডেপুটিকালেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী যশোদা নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তদীয় দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পদ্মগন্ধা পরীক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু নিম্নপ্রাইমারীর পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা নব্যাসম্প্রদায়ের তালিকা। প্রাচীনাদের মধ্যেও সামান্য রকমের বিদুষী মহিলা দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য নহে। যাহা হউক বর্ত্তমান এ উন্নতিতে স্ত্রী-শিক্ষা যে ভবিষ্যতে সুফলপ্রদ হইতে পারিবে, বেশ সূচিত হইতেছে। এক্ষণে যাহাতে ইহা সাধারণ পরিবারেও প্রসারিত হয়, সমাজ-হিতৈষী বৃন্দের নিকট তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা প্রার্থনীয়।

দেশভেদে ভাষার বিভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ। যদি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান চলিত, তবে কত যে সুখের ও সুবিধার আশা ছিল, তাহা পরিমাণ করা যায় না; কেন না, প্রত্যেক দেশের সুধীসম্প্রদায় বহুশ্রমার্জ্জিত তত্ত্বরাশি স্ব স্ব দেশজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছেন; সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্তৎভাষায় পারদর্শী হওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অধিকার না থাকিলে সমস্ত রহস্যও উদ্ঘাটিত করা দুরূহ। কিন্তু তাদৃশ সার্ব্বভৌমিক শিক্ষা সামান্য মানবজীবনে লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না। পূর্ব্বে এক সময়ে এ ভারতের প্রায় সর্ব্বাংশে হিন্দিতে কথোপকথন চলিত; কালক্রমে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বঙ্গীয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলে—দেশের এক গুরুতর অভাব নিরাকৃত হইবে।

সার্ব্বভৌমিক ভাষা।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা যায়, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার

প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইহা আবার বিবিধ কারণে ঘটিয়া থাকে।

ভাষাভেদ।

প্রথম—দেশবাসীর কর্ম্মতৎপরতা, দ্বিতীয়—প্রতিবেশী অপরাপর ভাষার সংঘর্ষণ এবং তৃতীয়তঃ—দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রকৃতি। যে দেশের লোক সাতিশয় কর্ম্মতৎপর (যেমন বন্দরাদিতে), এমন কি তালরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায় না, তথাকার ভাষা সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক—অনেকস্থলে সঙ্কেতমাত্র অবলম্বনে কার্য্য চালাইতে বাধ্য হয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থা কতকপরিমাণে খাটে; কারণ এখানকার জীবনকেও পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রকৃতিই বাধ্য করে। আবার বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে আসিলে, তাহাতেও একটা খিচড়ী না হইয়া যায় না। অধুনা আমরা অনেকগুলি ইংরাজী শব্দ একেবারে খাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি। এই যে 'খাসদখল' শব্দটী প্রয়োগ করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে। এস্থলে তৎপরিবর্ত্তে 'নিজ অধিকার' বসাইলে ঠিক উপযুক্ত (idomatic) প্রয়োগ হইলনা বলিয়া সম্ভবতঃ অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। এইরূপে সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্নভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশের জলবায়ু এবং শীতাতপের বিভিন্নতাও ভাষাবিচ্ছেদ ঘটাইবার পক্ষে সামান্য কারণ নহে। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোন কোন দেশের আবহাওয়ায় জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতান্ত বিকৃতি ঘটে। কোথাওবা কেবল অনুনাসিক উচ্চারণই ভাষার প্রকাশক। দেশ ভেদে এইরূপ নানা উচ্চারণ-বৈষম্যে ক্রমে পরস্পরের অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চাক্‌মাদিগের মূলভাষা বাঙ্গালা; তবে ইহা প্রচলিত বাঙ্গালার তুলনায় নিতান্ত বিকৃত, এবং সংক্ষিপ্তও কম নহে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা ইহাকে

চাক্‌মাবাঙ্গালা।

"চাক্‌মা-বাঙ্গালা"(The language is Chakma Bengali) নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)। বস্তুতঃ বঙ্গভাষা ক্রমেই পূর্ব্বদিকে বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণ অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ এ সকল দেশে পূর্ব্বে

(১) Vide—Appendix VII; part of A (Bengal code of cencus procedure.)

অঞ্চলে বসতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গালিগণ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আসেন, তখন তাঁহাদের সেই প্রাচীন অর্থাৎ প্রাকৃতবহুল বাঙ্গালামাত্র সম্বল ছিল (১)। পরবর্ত্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার কেন্দ্রস্থল হওয়াতে তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক দূরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দের পসার তত অল্প। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ভাষার সংঘর্ষেও যেকোন ভাষা বিকৃত এবং নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে চাক্‌মাভাষার মূল বাঙ্গালা হইলেও মঘ, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্তৃত। ফলকথা, ইহারা বিজাতীয় সমাজ হইতে যাহা যাহা অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ মোটামুটি বলা যাইতে পারে, চাক্‌মাগণ হিন্দুদের হইতে ভাষা ও দেবদেবী; মঘদিগের ধর্ম্ম, ব্যবহার, ভাষা, এমন কি অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত; ত্রিপুরাদের ভাষা, পূজা-পদ্ধতি ও আচার ব্যবহার; এবং মুসলমানদিগের ভাষা ও খাঁ প্রভৃতি উপাধি ইত্যাদি—পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সমুদয় জাতি হইতেই কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সাতিশয় জটিল, এবং ভাষাও এত দুরূহ হইয়াছে যে, অপর কোন জাতিরই সহজবোধ্য নহে। পরন্তু ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাক্‌মাও সরল বাঙ্গালা বুঝিতে পারে, এবং প্রায় বোধযোগ্য করিয়া উত্তর প্রদান করে। আবার ইহাদের মধ্যে "গোছা" বিশেষেরও কথার পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন "লার্ম্মা", "খেয়ংচেগে", ও "কুরাকুট্যা" গোছার লোকে "যাঙল্" (যাঙর), "এজঙল্" (এজঙর) ইত্যাদি রূপে "র" স্থলে "ল" বলে। আবার কোন কোন "গোছার" কথার টানও বিভিন্ন।

ইহারা কতিপয় সংস্কৃত শব্দ এমনি অবিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তন্মধ্যে—দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, পীড়া, চিৎ, অমৃত, সুখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু, মন, বিপদ, আপদ, ধন,

সংস্কৃত শব্দ।

(১) দৃষ্টান্তস্বরূপ—চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক কথা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' ও প্রাচীন পদাবলী" প্রভৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে পারা যায়। তা'ছাড়া এখানে এমতও অনেক কথা আছে, যা পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোথায়ও ব্যবহৃত নাই। এ সকল এবং আরও অন্যান্য কারণে বর্ত্তমান চট্টগ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ রাঢ়জ, তাহা সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়।

ধনী, মিত্র, বিচার, অন্তর, অকূল, শাক, গূঢ় প্রভৃতি শব্দগুলি সুপ্রথিত। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সংস্কৃতশব্দ সামান্য বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত। যথা :—

মূল সংস্কৃত	চাকমাভাষায় ;	মূল সংস্কৃত	চাকমাভাষায় ;
অভুক্ত	আহুধা ;	ঝটিতি	ঝাদি ;
আর্য্য	আং ;	দুঃখ	দুখ্ ;
উনানশাল ;	উনান্শাল ;	পিশুন	পিছুম্ ;
কলুষ	কুলুক ;	প্রত্যয়	পাত্যায় ;
কুত্র	কুধু ;	পিচ্ছিল	পিচ্ছোল ;
কুত্রাৎ (কস্মাৎ)	কুরৎ ;	বাস (গন্ধ)	বাচ ;
কর্ম্ম	কাম।	মে দেহি	মে দে ,
গোশালা	গোয়াল ;	শবশালা	চষাশালা ;
গুচ্ছ	গোছা ;	সন্দেহভাষা	ছন্দভাচ্ ;
ছায়া	ছাবা ;	হৃদয়ে	হৃদং ; ইত্যাদি।
জড়	জুর ;		

ধর্ম্ম ভিন্ন প্রচলিত কথায় প্রাকৃত-প্রভাব তাদৃশ অধিক নহে। সচরাচর কথোপকথনে—"উজু" (উজ্জু), "এজ্যা" (অজ্জ) ; "লড়ি" (লট্‌ঠী),

পালিশব্দ। "পাথর" (পথর), "দুয়ার", "ঘর", "থাম" (থম্ভ), "দুদ্" (দুধ্ধ), "দৈ", (দহী), "শিয়াল" (শিআ), "জিহ্" (জেট্‌ঠা), বাবন (বম্মণ), "দড়", "আন্ধান" (অন্ধ) "দুনা" (দুণা), "বুরা" (বুড্ঢ), "তেল", "মু" (মহু), "রূপা" (রূপ্পা), "মাছি" (মচ্ছি), "হোলদ্" (হলদ্দা), "পুথি" (পোথি) প্রভৃতি মূল এবং ঈষদ্বিকৃত পালি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

আর অবিকৃত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন্দ, ঢাক, গরীব, বৈদ্য, ভাজা, নিজ, চোখ, ওঝা, পরাণ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণ।

বাঙ্গালা শব্দ। আবার উচ্চারণ-বিকৃতি দোষে কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ সামান্য রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন,—"দুষ" (দোষ), "বিজ্জাচ্" (বিশ্বাস), "ভাপ" (ভাব), "কদা" (কথা), "বিগুণ" (বেগুন), "বালোস্" (বালিস), "বিষম্ লাগা" (বিষম্ লাগা), "বিছ্লাগা" (বিষলাগা) ইত্যাদি। এ ছাড়া, কোন কোন শব্দ বিশেষ পরিবর্ত্তিত এবং কোনটী বা অর্থান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ যথা,—"অবুজ" (অবোধ), "অমগদ" (গোঁয়ার),

"খেতখানা" (পায়খানা), "পূর" (ম্যাদ), "দো-ল্" (সুন্দর), "বারিজা" (বর্ষা), "কমলে" (কোন্ সময়ে) এবং "কাণা" শব্দে অন্ধকে বুঝায়। পাঠক মহোদয়েরা দেখিলেন, ইহারা সংস্কৃত কি বাঙ্গালার এমন অনেক শব্দ বিকৃত বা অবিকৃতভাবে ব্যবহার করে যে সমুদয় পূর্ব্ব কি উত্তরবঙ্গেও প্রচলিত নাই। তাহা ছাড়াও "মুজুং" (মৌসুম), "মাড়া" প্রভৃতি কতিপয় শব্দ পশ্চিম বঙ্গেরই অনুকরণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

আত্মীয় আহ্বান।

পরন্তু আত্মীয় আহ্বানেও বাঙ্গালীদিগের বিশেষতঃ হিন্দুগণের যথেষ্ট অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়; কোন কোন স্থলে সামান্য বিকৃতি ঘটিয়াছে মাত্র। যথা—পিতা বা শ্বশুর—"বা"; মাতা বা শাশুড়ী—"মা"; পিতৃব্য—"জিধু" (জ্যেষ্ঠতাত), "খুরা", "কাকা"; পিতৃব্যানী—"জেধেই" (জ্যেষ্ঠতাতপত্নী), "খুরী", "কাকী"; জ্যেষ্ঠভ্রাতা—"দাদা"; জ্যেষ্ঠাভগ্নী—"বেই"; কনিষ্ঠ ভাইভগ্নী—(স্নেহ-সূচক) "লক্ষ"; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ—"ভুজি" (১); মায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী—"মুঝি"; মায়ের জেষ্ঠা ভগ্নী—"জেধেই"; "মুঝি"-পতি—"মইঝা" এবং "জেধেই"-পতি "জিধু; পিসী—"পিঝেই; পিসা—"পিঝা"; মামা—"মামু"; —মামী—"মামী"; পিতামহ বা মাতামহ—"আযু", "দা"; পিতামহী বা মাতামহী—"বেই", "নান্থু"; ভগ্নীপতি—"বোনই" (২)।

সংখ্যা গণনার।

সর্ব্বোপরি ইহাদিগের সংখ্যাগণনা এক অদ্ভুত ব্যাপার! মোট কুড়িটী রাশি আছে কিন্তু প্রত্যেকটীরই অভিধা বিভিন্ন। ততোধিক গণনার আবশ্যক হইলে, 'এককুড়ি এত' বা 'দুই কুড়ি এত' বলিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচবার কুড়ি কুড়ি গণনার পর তবে এক শতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলিতে কি, এতাদৃশ প্রথা অদ্যাপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে সম্ভবতঃ ইহা তাহারই সংক্রমণ ফল। কিন্তু এই সংখ্যাগুলির নাম প্রায় বাঙ্গালা-প্রসূত হইলেও কোন্ অর্থে স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুরূহ। যথা:—১ একৃথ, ২ দিথ, ৩ তিতিরি, ৪ তিথ, ৫ কাচ, ৬ কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯ রাজা, ১০ দিন, ১১ হাত, ১২ গাৎ, ১৩ ব্রাহ্মণ, ১৪ ছকি, ১৫ ধর্ম্য, ১৬ তাৎ,

(১) চট্টগ্রামের হিন্দুগণ "ভইজ" এবং মুসলমানেরা "ভাউজ" সম্বোধনে "ভাজি" বলিয়া থাকে।
(২) চট্টগ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বলে—"বোনাই"।

১৭ গন্দা, ১৮ গন্ডি, ১৯ উনিশ, ২০ কুড়ি। কিন্তু বর্ত্তমানে এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে, অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়; প্রায় সকলেই এক দুই করিয়াই গুণে।

ক্রিয়াপদের রূপ সংস্কৃত-অনুকরণে হইলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তৎসমুদায় অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় উপনীত হইবার কালে একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। একবচন ও বহুবচন লইয়া ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়। কাল, পুরুষ ও বচনভেদে বিভক্তি সকল অষ্টাদশবিধ। ক্রিয়াবিভক্তি যথা:—

ক্রিয়া বিভক্তি।

		একবচন	বহুবচন
বর্ত্তমানকাল	উত্তমপুরুষ	আং	এই
	মধ্যমপুরুষ	এইচ্	অ
	প্রথমপুরুষ	য়	ন্
ভবিষ্যৎকাল	উত্তম পুরুষ	এইম্	এমং
	মধ্যমপুরুষ	এযে	এথা
	প্রথমপুরুষ	এব	এযাক্
অতীতকাল	উত্তমপুরুষ	এইয়ং	ইয়েই
	মধ্যমপুরুষ	ইয়চ্	ইয়.
	প্রথমপুরুষ	ইয়ে	ইয়ন্

বাঙ্গালা পদ্যের "মুই", "তুই" সর্ব্বনাম চাক্‌মাভাষায় যথাক্রমে উত্তম ও মধ্যমপুরুষের একবচনে তুচ্ছার্থে এবং অতুচ্ছার্থে প্রচলিত; কিন্তু আশ্চর্য্য রূপান্তর এই, ইহারা "আমি" এবং "তুমি" শব্দে বহুবচনার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। অন্যতঃ প্রথম পুরুষের একবচনে—সংস্কৃত "তে" এবং বহুবচনে বাঙ্গালা পদ্যের "তারা" সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় সর্ব্বনামের সম্ভ্রমার্থে কোন বিশেষ রূপ নাই বটে, কিন্তু তাদৃশ সম্মানিত স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণে একের প্রতিও বহুবচনের রূপ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বক্তব্য কিঞ্চিৎ স্পষ্টতর করিতে এস্থলে একটী ক্রিয়ারূপ উপযুক্ত সর্ব্বনাম সহযোগে প্রদর্শিত হইল। গমনার্থ-বোধক ক্রিয়ারূপ যথা:—

সর্ব্বনাম।

বর্ত্তমান কাল।

বাঙ্গালা কথা।	চাক্‌মা কথা।
আমি যাই	মুই যাং

বাঙ্গালা কথা।	চাক্‌মা কথা।
আমরা যাই	আমি যেই
তুই বা তুমি যাও	তুই যেইচ্
তোরা বা তোমরা যাও, অথবা আপনি যান	তুমি য
সে যায়	তে যায়
তাহারা যায় বা তিনি যান	তারা যান

ভবিষ্যৎ কাল।

আমি যাব	মুই যেইম্
আমরা যাব	আমি যিমই
তুই যাবি বা তুমি যাবে	তুই যেবে
তোরা যাবি বা তোমরা যাবে অথবা আপনি যাবেন	তুমি যেবা
সে যাবে	তে যেব
তাহারা যাবে বা তিনি যাবেন	তারা যেবাক্

অতীত কাল।

আমি গিয়াছিলাম	মুই যেইয়ং
আমরা গিয়াছিলাম	আমি যিয়েই
তুই গিয়াছিলি বা তুমি গিয়াছিলে	তুই যিয়চ্
তোরা গিয়াছিলি বা তোমরা গিয়াছিলে অথবা আপনি গিয়াছিলেন	তুমি যিয়
সে গিয়াছিল	তে যিয়ে
তাহারা গিয়াছিল বা তিনি গিয়াছিলেন	তারা যিয়ন্

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহারা মগভাষা হইতে বর্ণগুলি অনুকরণ করিয়াছে। কেননা ইহাদিগের বর্ণমালা এবং বর্ণসংযোগে ব্রহ্মবাসীদের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট যায়। ফলতঃ ব্রহ্মা এবং বঙ্গীয় বর্ণাবলীর উৎপত্তিস্থলও বিভিন্ন নহে; একই বৃক্ষের কাণ্ড হইতে নানা শাখা নানা আকারে গঠিত হইয়া ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" প্রদর্শিত "অশোকের সময় (২৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রম-বিকাশের সহিত ব্রহ্মা ও চাক্‌মা বর্ণসমূহের সাদৃশ্য দেখাইয়া পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় এক খানি তালিকা প্রদত্ত হইল।

বর্ণাবলী।

ইহাতে দেখা যায়, খ, গ, ঘ, থ, ম, য, স এবং হ তে কোন পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। অবশিষ্টের মধ্যে অ, ক, চ, ছ, ঙ, ট, ত, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ,

প্রাচীন বাঙ্গালা, ব্রহ্ম এবং চাক্‌মা।

এবং ল প্রভৃতি বর্ণ যৎসামান্য রূপান্তরিত মাত্র। এতদতিরিক্ত যে বর্ণাবলী রহিল, তাহাদের মধ্যেও যে আকৃতিগত একটা সম্পর্ক না রহিয়াছে, এমত নহে। সময়সাগরের কত তরঙ্গাভিঘাত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এত পরবর্ত্তীকালের জীব আমরা যে প্রাচীন নিদর্শনের এতটা সাদৃশ্যেরও অস্তিত্ব পাইতেছি, তাহাও পরম সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মার সহিত চাক্‌মাবর্ণমালার সাদৃশ্য এবং সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠযুক্ত। সম্ভবতঃ ত্রিপুরাদিগের ন্যায় চাক্‌মাদিগেরও লিখন প্রথা বা বর্ণমালা ছিল না, অনন্তর ব্রহ্মদেশে অবস্থিতিকালে নানা অসুবিধায় পড়িয়া তথাকার বর্ণাবলী গ্রহণ করিয়া থাকিবে। পূর্ব্বপৃষ্ঠায়বিন্যস্ত আদর্শেই পরিলক্ষিত হইবে,

ব্রহ্ম ও চাক্‌মা।

স্বরবর্ণ গুলির মধ্যে 'উ'টী সম্পূর্ণ অবিকৃত; 'অ' ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং অপর দুইটী — ই, এ বর্ণে তারতম্য কিঞ্চিত অধিক থাকিলেও ব্রহ্মার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সহিত তাদৃশ অনৈক্য নহে। ব্যঞ্জনবর্ণে—ক, খ, গ, ঘ, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ব (ওয়া), স ব্রহ্মবর্ণের সহিত অভিন্নপ্রায়; ঙ, চ, ছ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ভ, ল, হ ইত্যাদি বর্ণেও অতিসামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে; অধিকন্তু তৎ ক্রমপরিবর্ত্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র এবং হ্ল তে সামঞ্জস্য উদ্ধার কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ সৌসাদৃশ্য সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায়। চাক্‌মা-সমাজের এ অনুকরণ অল্পদিনের কথা নয় ইহার উপর দিয়া কত কত রাজামহারাজার প্রভুত্ব—জগতের কত অনন্ত পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ণমালার এ সামান্য পরিবর্ত্তন ধর্ত্তব্যই নহে। বিশেষতঃ অনুকরণে প্রায়ই খাঁটি জিনিষ থাকে না, অনুকারী হয়তঃ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির সংযোগে একটা অভিনব পদার্থ গড়িয়া তোলে, অন্যথা তাহা যতদূর পারা যায়—সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এ ক্ষেত্রে কেবল আকৃতিগত সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াই অনুকরণ-কর্ত্তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, বর্ণসংখ্যাও যথাসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃতমাতৃক বলিয়া এই বর্ণগুলিও স্বর এবং ব্যঞ্জনভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

স্বরবর্ণ।

ব্রহ্মাদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটী— ৠ এবং ঌ ইহাদের নাই। কিন্তু চাক্‌মাগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ

বর্ণচতুষ্টয়মাত্র গ্রহণ করিয়াছে। ই-ঈ এবং উ-ঊ পরস্পরে কোন প্রভেদ নাই। 'অ' এর উচ্চারণ—আ; তদুপরি (( ) মাথা তুলিয়া দিলে অর্থাৎ রেফাক্রান্ত করিলে 'অ' উচ্চারিত হয়। তা' ছাড়া 'অ' এর উপর ( )) বামমুখী আর একখানি শিখা তুলিয়া দিলে 'ঐ' এবং 'অ' এর নীচে 'উ' দিলে 'ও' উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন,—

অ উচ্চারণে—   ও উচ্চারণে—

এ উচ্চারণে—   ঔ উচ্চারণে—

ইহাদের মধ্যে নাই।

ব্যঞ্জনবর্ণ।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ব্রহ্মভাষারই অনুরূপ বত্রিশটী। তৎমধ্যে বর্গীয়বর্ণগুলি ঠিকই আছে; অন্তস্থ বর্ণের য—'য়্যা' এবং ব—'ওয়া' (১) সংজ্ঞায় গ্রথিত। পালির ন্যায় তালব্য 'শ' ও মূর্দ্ধন্য 'ষ' এর শাসন ইহাদের মধ্যে নাই। উষ্মবর্ণে অবশিষ্ট 'স' ও 'হ' ব্যতীত ব্রহ্মবর্ণাবলীর অনুকরণে (লাজিয়ে) 'হ্ল' নামে আর একটী বর্ণ আছে, তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বিরল। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুস্বার এবং বিসর্গের প্রচলনও ইহারা অজ্ঞাত নহে; তবে চন্দ্রবিন্দুর কাজ ন্ দ্বারা সারিয়া যায়। পরন্তু পালির ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণ সকল কা—খা—গা—ঘা ইত্যাদি ক্রমে আকারান্ত করিয়া উচ্চারিত হয়; বিশেষ পরিচয়স্থলে—তৎসঙ্গে আকৃতিসূচক বিশেষণযোগে পাঠ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য—তৎসমুদয় বিশেষণ "আঁকুড়ে ক" "বকা ঠোঁটে খ" প্রভৃতি রূপান্তর মাত্র। তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ইহারা সচরাচর 'স'কে 'হ' এর ন্যায় উচ্চারণ করে এবং ট, ঠ, ড, ঢ, এর উচ্চারণ যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ, এর সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। যথা, ক—"চুচ্যাজ্যা কা", খ—"গুজাজ্যা খা", গ—"চান্দ্যা গা", ঘ—"তিনঠাল্যা ঘা", ঙ—"ছিলামুঙা ঙা", চ—"ত্বিডাচ্যা চা", ছ—"মজছ্যা ছা", জ—"দ্বিপদলা জা", ঝ—"উয়াউবি ঝা", ঞ—"তিশচ্যা ঞা", ট—"ত্বিয়াদা তা", ঠা—"কোডাদিয়া থা", ড—"আঁড়ুভাঙা দা", ঢ—"লেজভরা ধা", ণ—"পেট্রোয়া পা", ত—"গঙদা টা", থ—"জয়দা ঠা", দ—"তুলনি ডা", ধ—"তলমো ঢা", ন—"কার্বাণ্যা না", প—"পাল্যা পা", ফ—"উয়রবোঝা ফা", ব—"উয়রমু বা", ভ—"চেরেদা ভা", ম—"বুগদ্‌-পদলা মা", য—"ছিমুছ্যা য়্যা", র—"ত্বিদাজ্যা রা", ল—"তলমুয়া লা",

(১) এই 'ওয়া' উচ্চারণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—যোয়ারী (যারী), ঈশোয়ার (ঈশ্বর) ইত্যাদি।

ব—"বাজন্তা ওয়া", স—"ভূতিবক্যা ছা", হ—"উয়রমুয়া হা" এবং হ্ল—"ল্যাজিরে হ্ল"।

স্বরসংযোগ।

এই সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণকে অকারান্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পূর্ব্বোক্তরূপে মস্তকোপরি ( ) রেফস্থাপন প্রয়োজন। ই-ঈকার ( ) শূন্য বিশেষ মাত্র, ব্যঞ্জনের দক্ষিণপার্শ্বোপরি বসে। এবং উ-ঊকার (বা) একটান বা দুইটান নিম্নে, একার ( )—ঠিক বাঙ্গলার ন্যায় পূর্ব্বভাগে স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববর্ণিত পদ্ধতিতে ঐকার যোগ করিতে হইলে, মস্তকে রেফ্ এবং বামমুখী শিখা উত্তোলন, ঔকারে মস্তকে রেফ এবং পাদদেশে 'উ' সংযুক্ত করা গিয়া থাকে। উদাহরণ যথা,—

ক কা কি কু কূ কে কৈ কৌ

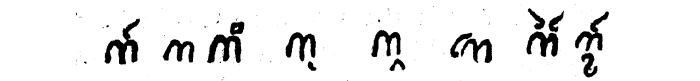

হসন্তবিধান।

অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু—পৃথক্ বর্ণ নহে, হলন্ত বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র। বলিতে কি, ইহাদের মধ্যেও তাদৃশ বিধি লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চাক্‌মালেখায় হলন্ত 'ন্' দ্বারা চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অনুস্বার এবং বিসর্গের নিমিত্ত সংস্কৃতানুকরণে যথাক্রমে (•) একটী এবং (••) দুইটী বিন্দু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এই বিন্দুগুলি সংযোক্তব্য বর্ণের মস্তকোপরি স্থান পায়। হসন্তচিহ্নও (—) মাত্রার ন্যায়; তবে বর্ণের ঈষদুপরি স্থাপিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় ক, ঙ, চ, ঞ, ত, ন, প, ম, য়, র এবং ল এই কয়েকটী বর্ণে মাত্র হসন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসন্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা,—ক্ (কাক্), ঙ্ (কাঙ্), চ্ (কাচ্), ঞ্ (ঞেই), ত্ (কাং), ন্ (কোন্), প্ (কোপ্), ম্ (কাম্), য়্ (কেই), র্ (কার্), ল্ (কাল্) ইত্যাদি। কিন্তু অপর কোন স্বরান্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারণের উক্ত 'ক' হইয়া যায়। হলন্ত 'ওয়া'র উচ্চারণ—য়। বর্ণবিন্যাসের এই অংশ অত্যন্ত দুরূহ। তবে সংযুক্তবর্ণ লিখিবার একটী বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা সামান্যরূপ জটিল হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিন্যাসের সরল সঙ্কেত বলিতে হইবে। উপরেই দেখান হইয়াছে, বর্গীয় বর্ণের প্রথম ও পঞ্চমবর্ণে মাত্র হসন্তযোগ করিতে পারা যায়। সংযুক্ত বর্ণের যে বর্ণটী নিঃস্বর, তাহা যদি বর্গের প্রথম বা পঞ্চম বর্ণ না হয়, তবে সেইটী যে বর্গের—সে বর্গের প্রথমবর্ণোপরি হসন্ত চিহ্ন দিয়া, পরে

উক্ত বর্ণ অকারান্ত করিয়া বসাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন 'গয়' ; চাকমা-লেখায়—'লক্‌গন'। অন্ততঃ 'স' তে হসন্তচিহ্ন প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই। যেখানে 'স' কে হলন্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তথায় 'চ'—'স' এর অধিকার পায়। যেমন পুরচ্‌কার (পুরস্কার), বাচ্‌প (বাষ্প) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে রেফের কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই ; রেফ্‌ যুক্ত করিতে হইলে পূর্ব্ব-ভাগে 'র' স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে বর্ণ টী লিখিতে হয়। উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের আরও একটী সরলবিধি এই যে, শব্দের অন্ত্য যে ব্যঞ্জন হলন্ত করিয়া উচ্চারিত হয়, লিখিবার সময়ও তাহাতে হসন্তচিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে।

য (য়), র এবং ব (ওয়া) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র 'ফলা'রূপে অপর ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়। 'য ফলা'টী (্য) প্রায় বাঙ্গলারই অনুরূপ—বর্ণের পশ্চাতে বসে। 'র ফলা'টী (্র) একটু অধিক বক্র বটে, কিন্তু দেখিলেই বাঙ্গলাভাব আসে এবং তদনুরূপ পাদমূলে বসিয়া থাকে। প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি, ইহাদের স্বতন্ত্র কোন ঋকার নাই। কিন্তু এত-ক্ষণ যাবৎ তাহার কার্য্য বুঝাইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম না। কোন বর্ণে ঋকার যোগের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে 'র ফলা' ও ইকার যোগ করিলেই উদ্দেশ্য সম্পা-দিত হয়। যথা,—ক্রিত (কৃত)। এতদ্ভিন্ন 'ব' অর্থাৎ 'ওয়াফলা' ও (০) একটী শূন্য মাত্র—বর্ণের পদপ্রান্তে স্থান পায় ; উচ্চারণ সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেরই মত 'ওয়া' অর্থাৎ দোয়ারী (দ্বারী), দোয়ারিকা (দ্বারিকা) ইত্যাদিক্রমে হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত প্রতিলিপি হইতে আশা করি, মদীয় বক্তব্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

ফলা।

স ৎ পু ত্র বং স উ চ্‌ জ ল ক রে

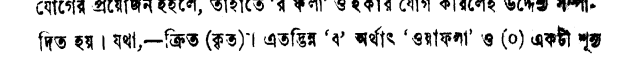

গ্রি চ্‌ ম কা লে র বির কি র ণ তি ক্‌ ণ হ

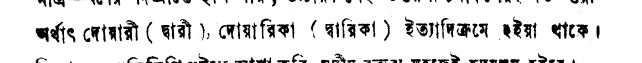

ভাষার মূল এবং গঠনপ্রণালী যথাসম্ভবরূপে প্রদর্শিত হইল। পরিশেষে বাঙ্গলা, পালি এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর ভাষা হইতে যে যে শব্দ ইহাদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়াই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। তবে ইহা দ্বারা

অপরাপর ভাষার শব্দ।

বিজাতীয় সংগ্রহের গভীরতা পরিমাণ করিতে গেলে, প্রমাদে পতিত হইতে হইবে মাত্র। কারণ, মঘত্রিপুরাদি জাতির, যাহাদের সহিত ইহাদিগের বহুকাল ধরিয়া একত্র বসবাস চলিতেছে, অতি অল্পসংখ্যক শব্দই চাক্‌মা সমাজে অধিকার পাইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত শব্দসংখ্যা লইয়া জাতীয় নৈকট্য পরিমাপ নির্ণীত হইলে বিপরীত ফলই লাভ হইবে। মঘভাষার শব্দ যথা :—খবং (গম্বং), খিসা (কিজা), গুয়াম্‌ (গুয়াঁবা অর্থাৎ পেয়ারা), খিরা (দংখেরাবাঁ. অর্থাৎ ক্ষিরা), লোন্তা (লোরা অর্থাৎ ঘটী)। ইত্যাদি ; ত্রিপুরাভাষার শব্দ যথা :— তাগল (তাকুয়াল অর্থাৎ দা) ইত্যাদি ; আরবীভাষার শব্দ যথা :—হাগিম, হুগুম, মুলবী (মৌলবী), মেজবান্‌, চাবি, চালাগ, জিদ ইত্যাদি ; পারসীভাষার শব্দ যথা :—ফৌজদারী, কাছারী, লৌ, জোয়ানবন্দি (জবানবন্দী), ফর্য্যাদি (ফরিয়াদী) ইত্যাদি ; হিন্দিভাষার শব্দ যথা :—মামী, জার (জারা অর্থাৎ শীত), আন্দাজ, চেয়ারা (চেহারা), জঁগল (জঙ্গল) ইত্যাদি ; চীনভাষার শব্দ যথা :—ছাটিন্‌ (সাটিন) লেচু (লিচু), চিনি ইত্যাদি ; মালয়ভাষার শব্দ যথা :—ছাউ (সাগু) ইত্যাদি ; হিব্রুভাষার শব্দ যথা :—সেতান্‌ (সয়তান) ইত্যাদি ; ইংরাজীভাষার শব্দ যথা :—গভর্ণমেন্ট (গভর্ণমেণ্ট), কমিছনার (কমিশনার), জজ, মাজষ্টর (ম্যাজিষ্ট্রেট), আপিল, নুটিস (নোটিস), গলস (গ্লাস), রেক্কার (রফর) ইত্যাদি ; ফরাসীভাষার শব্দ যথা :—ফেঁরাঁই (ফিরিঙ্গি), জিন, বিছ্‌কুট (বিসকিট) ইত্যাদি ; পটু'গীজভাষার শব্দ যথা :— বারান্দা (বারেন্দা), ফিতা, বেলা (বেহালা), গির্জ্জা (ইগ্রিজা—আমাদের কথায় গির্জা), পাদারী (পাদ্রী), কাদিয়া (কেদেরা), ছাবন (সাবান), আলমারী (আলমিরা) ইত্যাদি ; স্পেনীয় ভাষার শব্দ যথা :—সেরি ইত্যাদি ; দেনমার্ক-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :—বারান্দি (ব্রাণ্ডী), ডেক ইত্যাদি ; ইতালী-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :—সোদা (সোডা), কুম্পেনী (কোম্পানী), পিতল, লিস্তি (লিষ্ট), বুরুছ্‌ (ব্রুস্‌), কাপ্তান, ইত্যাদি নানা বিজাতীয় শব্দের দ্বারা চাক্‌মাভাষা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদর্য্য বাঙ্গলা শব্দগুলিও ক্রমে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপ-ভ্রষ্টতার নির্ব্বাসন স্বাভাবিক। অধুনা ইহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাদৃশ কোন শব্দবিকৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা করা যায়—শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হইলে, বাঙ্গলা ও চাক্‌মাভাষায় উপলব্ধি করিবার উপযোগী কোন বিশেষ তারতম্য থাকিবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

[১] কবি ও কবিতা ;

[২] বারমাস—[৩] ছড়া—[৪] হেঁয়ালী।

—:*:—

[১]

কবিতা সঙ্গীত শাস্ত্রের সুশোভন পরিণাম। ভগবদ্দত্ত মধুর কণ্ঠ না পাইয়াও কবি ভাবের নীরব ঝঙ্কারে ছন্দের মোহিনী ক্রিয়ায় জগৎ মাতাইয়া তোলেন ;

কবিতা ও সঙ্গীত।

সেতার, এস্রাজ, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি নানা রাগ-রাগিনী আলাপী মনোহর যন্ত্রনিচয় তাঁহাদের প্রয়োজনে আসেনা। সঙ্গীতের পদ জানা থাকিলে ও তদ্দ্বারা কর্ণতৃপ্তিমানসে সুগায়কের আশ্রয় আবশ্যক ; কিন্তু কবি সেরূপ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। উভয়ের রচনা প্রণালীতেও প্রভেদ বিস্তর। কবিতায় ভাষা ও ব্যাকরণের প্রভাব যত অধিক, সঙ্গীতে তেমন নয়। সঙ্গীতে পদ্য-গৌরব যেন অতি সামান্য, তাহাতে কেবল মাত্রা লইয়া গণনা ; শেষভাগে স্বর বা ব্যঞ্জনের ঈষৎ সাদৃশ্য থাকিলেই যথেষ্ট। পরন্তু কবিতা অমিত্রাক্ষরে চলিলেও চরণ পূরণ কঠিনতর—প্রত্যেক স্বরবর্ণ লইয়া অক্ষর গণনা করা হয়। তদুপরি আবার যতির কড়া শাসন রহিয়াছে।

ফলতঃ এস্থলে আমার এতাদৃশী ভূমিকা নিতান্ত নিরর্থক। চাক্‌মাদিগের কবিতাগুলি এযাবৎ সঙ্গীতের পাশমুক্ত হইতে পারে নাই। প্রায় কবিতাই প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত গানের অনুরূপ অন্য এক উপবাক্যের সহিত অতি নিকৃষ্ট মিলনে সহবাস করিতেছে। এমন কি, এ সকল তান-লয় সমন্বয়ে গীত হইয়াও থাকে। তথাপি তাহাদিগকে যে কবিতা আখ্যা দিলাম, সে কেবল ভাব-প্রবণতা এবং ঐতিহাসিকতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, নানা রাগ-রাগিণীতে উদ্গীত

কবিতায় কথকতা।

হইলে ও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকাগুলিকে যেমন কবিতাসমষ্টি ধরা হয়, এইগুলিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। উৎসব-আমোদে চাক্‌মাগণ কথকদিগের সাহায্যে সেই পৌরাণিক কাহিনী সমূহ শুনিবার ব্যবস্থা করে। প্রশস্ত স্থানে 'সভাস্থল' সজ্জিত হইয়া থাকে। পরে যথাসময়ে নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, "গেনকুলী" মহাশয় কোকিল-বিনিন্দিত

রাগিণীতে সভাজনকে বিমুগ্ধ করিয়া বক্তব্য আরম্ভ করে। নান্দীপাঠ তাহার প্রথম কার্য্য,—'সভাবন্দন' দ্বিতীয়। আখ্যায়িকার উপসংহার হইলে গৃহস্থও উপস্থিত সাধারণের মঙ্গল প্রার্থনা এবং স্বকীয় বিনীত নিবেদন ইত্যাদি করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত সকলেই "গেনকুলীকে" পুরস্কৃত করে, বলা বাহুল্য, অপর সাধারণ অপেক্ষা গৃহস্থের পারিতোষিকের পরিমাণ অধিক থাকে।

কথকতা শিক্ষা সাপেক্ষ। এই তানলয়বদ্ধ কাহিনী এবং তদ্‌ব্যাখ্যা প্রভৃতিও শিখিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ চাক্‌মাদিগের এ সকল কথকগণকেও কবি বলা যাইতে পারে। যদিও তাহাদের বর্ণিত আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে, তথাপি মধ্যে মধ্যে লোকরঞ্জন মানসে তাহাদের স্বীয় যোজনা যথেষ্ট দেখা যায়। সমগ্র চাক্‌মা সমাজে বর্ত্তমানে প্রায় ১৫। ২০ জন প্রথিতনামা কথক আছে; তন্মধ্যে 'আকুকাণা' নামক অন্ধই সর্ব্বপ্রধান। ইহার বাড়ী চেঙ্গীরকূলে, সাকিন তৈচাক্‌মা—"ফাক্‌সা গোছা", "বালকাগোষ্ঠা" সম্ভূত। জন্মদিন লিপিবদ্ধ নাই, বয়স অনুমান ৫৬,৫৭ বৎসর। এ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার সুমধুর কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, পরমপিতা তাহাকে দৃষ্টিশক্তিহীন করিয়া কোন সদুদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তজ্জন্য ক্ষতি অনুভব করিতেছি। কবি বা কথক।

আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান", "চাটিগাঁ ছাড়া" "সৃষ্টিপত্তন", "স্বর্গপালা" এবং "লক্ষ্মীচরিত্রের" নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের স্থূলমর্ম্ম প্রথম পরিচ্ছেদেও বিবৃত করিয়াছি; এস্থলে সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইল। যে যে স্থানে বর্ণনা-বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তত্তৎস্থল মাত্র অবিকৃত রাখিয়া পাঠকসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে অপর আখ্যায়িকা ভাগ গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া দিলাম।— কবিগ্রন্থ।

ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান।

সাধ্বিংগিরি রাজার একমাত্র কন্যা, নাম রূপতি। রূপতি স্বয়ংবরা হইয়া জয়মঙ্গলকে বিবাহ করে। তাহাদের সংসার বড়ই সুখে চলিতেছিল; কিছুকাল পরে রূপতি এক কন্যা প্রসব করিল; তাহার নাম হইল "ধনপতি"।

চম্পক নগরে সাধ্বিংগিরি রাজা ছাড়া হরিশ্চন্দ্র নামে অপর এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর নাম—মেনকা। রাধামোহন ইঁহাদের পুত্র এবং নিলপতি কন্যা। বাল্যকাল হইতেই রূপতি ও মেনকার মধ্যে বড় বেশী ভাব জন্মিয়াছিল। বয়সাধিক্যের সহিত রূপতি ও মেনকা।

তাহা অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। একে অপরকে প্রাণান্তপণে সাহায্য করিত; একে কোন স্থানে কার্য্যোপলক্ষে যাইতে হইলে আপন পুত্র কন্যাকে অন্যের হেপাজতে রাখিয়া যাইত। একবার মেনকা রাধামোহনকে কপতির নিকট রাখিয়া যায়। রাজা সাধ্বিংগিরি তখন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বাৎসল্যাকর্ষণে ধনপতি ও রাধামোহনকে একই দোলনায় রাখিয়া নিজেই দোলাইতে লাগিলেন এবং গাহিতেছিলেন,—

"সোনা-দোলনৎ রূপার দড়ি
দাদাটৈ নেবেই ঘুম যাদন্ সমারে পড়ি।
অলিরে অলি ধি—ধি—ধি॥"

অন্বার্থ:—"সোণার দোলনায় রূপার দড়ি; নাত্নী আমার নাতীর সঙ্গে পড়িয়া ঘুম যাইতেছে। (অলিরে ইত্যাদি দোলনার তান।)"

বৃদ্ধ যেন লোকাতীত প্রতিভাবলে ভবিষ্যতের মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার দোল্‌নার অপর গান যথা:—

"হাদৎ লয়ে বাদোল্ বাশ কুর্জ্জাৎ লয়ে গুলি;
আমা-দাদা মারি আনি দিব গৈ বনর পাখী।
অলিরে অলি ধি—ধি—ধি॥"

অন্বার্থ:—"হাতে 'কামঠা' ও কোচরে 'গুলি' লইয়া (রাধামোহন) দাদা আমার বনের পাখী মারিয়া আনিয়া দিবে। অলিরে ইত্যাদি।"

ইহাতেও বৃদ্ধের দূরদর্শিতা পরিব্যক্ত হইতেছে।

ক্রমে ধনপতি ও রাধামোহন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে, উভয়ের মধ্যে অলক্ষিত ভাবে প্রণয় সংস্থাপিত হয়। অবশেষে একদা রজনীভাগে উভয়ে অরণ্যে পলাইয়া যায়। এদিকে তাঁহাদের খোঁজ আরম্ভ হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা এক নদীকূলে ধৃত হন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিশেষ আড়ম্বর সহকারে যথাবিধি তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সুসম্পাদিত হইল।

ধনপতি ও রাধামোহন।

চম্পকনগরের প্রধান রাজার নাম উদয়গিরি, সাধ্বিংগিরি ও হরিশ্চন্দ্র তাঁহারই সামন্ত রাজা। উদয়গিরি রাজার দুই পুত্র; বিজয়গিরি জ্যেষ্ঠ এবং সমরগিরি কনিষ্ঠ। রাজা বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত; উপযুক্ত পুত্র বিজয়গিরির হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু বিজয়গিরি ইতিমধ্যে দিগ্বিজয় ব্যপদেশে দক্ষিণাভিমুখে অভিযান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাধামোহনকেই সেনাপতিপদে বরণ স্থিরীকৃত হইল। তজ্জন্য রাধামোহনের নিকট লোক প্রেরণ

রাধামোহনকে সৈনাপত্যে বরণ।

করিলেন। ধনপতি পূর্ব্বরাত্রে: ভীমরাজ নামক পক্ষীবিশেষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়াছিলেন। সেই কারণে অনিষ্টপাত ভয়ে ধনপতি রাধামোহনকে রাজাজ্ঞায় গমনে প্রথমতঃ বারণ করেন, কিন্তু রাধামোহন রাজাদেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে সাহস করিলেন না। বিজয়গিরি সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি রাধামোহনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিতে পারেন, তবে তাঁহাকে বিজিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সমর্পণ করিবেন। ইহাতে রাধামোহন অধিকতর উৎসাহিত হইয়া অবিলম্বে মধুসথা চৈত্রের দশম দিবসে চম্পকনগর হইতে যাত্রা করিলেন। পথে আসিতে মনে হইল, এ সময়ে একবার ধনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বীয় প্রাণেশ্বরকে রণসজ্জায় বিভূষিত দেখিয়া ধনপতি পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গলাশঙ্কায় অধীরা হইলেন। রাধামোহন নানাবিধ প্রবোধবাক্যেও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাধামোহন—

("সুরে এত্তন্ পিপীরা,") (১)

এয়জি তগাগৈগ তিবিরা।"

প্রতিনিধি দিবার জন্য 'ত্রিপুরা' অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

"(কুচি রাণ্যা কাদাবন,)

জয়নারাণ রোয়াজা-ইচু গেল্ রাধামন।"

রাধামোহন (ত্রিপুরাদিগের জনৈক সর্দ্দার) জয়নারায়ণ রোয়াজার নিকটে গেলেন।

"(ছরা আগারে জুনি যায়,)

তুমি রাধামন কুনি যায়?"

(তাপিত ভাঙি পিপাতা,)

জয় নারাণ রোয়াজা পুঝার লয় এই কথা।"

রাধামোহন আপনি কোথায় যাইতেছেন, জয়নারায়ণ রোয়াজা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"(চৈদে বৈশাখে পৈল্ বিজু,)

এয়জি তগেচুং এচ্ছ্যাং ভর্ ইচু।"

(রাধামোহন বলিলেন) তোমার এখানে (যুদ্ধের) প্রতিনিধি খুঁজিতে আসিয়াছি।

"(আলু কুরি কামাত্তুন,)

এয়জি প্যোম্‌মে তমা-পাড়াত্তুন?"

তোমার পাড়া হইতে প্রতিনিধি পাইব কি?

(১) এই বন্ধনীবদ্ধ পংক্তিগুলি কেবল পদমিলনের জন্য ব্যবহৃত; বক্তব্য বিষয়ের সহিত তাহাদের অর্থগত কোনও সম্বন্ধ নাই।

"(বেইনে বুনি কয় তারাম্,)
পাড়াপড়সী ডাকিল জয়নারায়ণ।"

জয়নারায়ণ (রোসাঙ্গ এই কথায়) প্রতিবাসীগণকে ডাকিলেন।

"(ধারেয়া তাগল্লৈ কাবং বন,)
এয়জি আগনে কোন জন ?"

(জিজ্ঞাসা করিলেন) তোমরা কেহ (সেনাপতি রাধামোহনের) প্রতিনিধিরূপে অগ্রসর হইতে পার ?

"(শুলা খেলুং কুসুমে,)
ছয় কুড়ি টেঙা দিদ কয় মুজুঙে।"

(এজন্য) আগামীতে ১২০ টাকা দিতে বলিতেছে।

ইহাতে তাহারা বলিল :—

"(চৈল্ কারি ঝারিদং নয়,)
ছয়কুড়ি টেঙা ক্যা—দ্বিশত টেঙা দিলেও আমি পার্ত্তং নয়।"

১২০ টাকা কেন—দুইশত টাকা দিলেও আমরা পারিব না।

অনন্তর—

"সুপারী কিনি আধাপণ)
তিবিরা ন প্যেই ফিরি এল ঘরৎ রাধামন।"

রাধামোহন ত্রিপুরা (প্রতিনিধি) না পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"(উড়েল বয়ারে রণগতি,)
এয়জি পেলে কি নপেলে পুঝার লয় ধনপতি।"

ধনপতি (রাধামোহনকে) প্রতিনিধি পাইলেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাধামোহন বলিলেন :—

"(ইজরৎ নিগলি চান্ ন-চান্,)
দ্বিশত টেঙা দিলেও তিবিরা খাম্ ন-খান্।"

দুইশত টাকা দিলেও কোন ত্রিপুরা সাহস করে না।

পরিশেষে রাধামোহন ধনপতিকে অনেক বুঝাইয়া চৈত্রের ১৫ই তারিখে রণযাত্রা করিলেন। আর এদিকে পতিবিরহ বিধুরা ধনপতি বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

"লইয়ে পরাণে বিড়বিড়ি
খেলুং মাথা তর রাজা বিজয়গিরি।"

'পরাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, (যুবরাজ অর্থে) রাজা বিজয়গিরি তোর মাথা খাই।'

বলিয়া রাখা ভাল এ সময়ে ধনপতির গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

ইতি ধনপতি-রাধামোহনের উপাখ্যান ভাগ সমাপ্ত।

চাটিগাঁ ছাড়া।

এই আখ্যায়িকাখানি উপরি উক্ত উপাখ্যানের দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র। তবে ইহার বর্ণনীয় কথা যে দিগ্বিজয়, তাহার প্রথম উদ্যোগ হইতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যথা;—

যখন যুবরাজ বিজয়গিরি দক্ষিণাভিমুখে দিগ্বিজয় গমনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন, সেই সময়ে—

"(রাঙা কালা সুইৎ ছিনে),
নানান্ কুসপন্ দেগে রোয়াং রাজা দগিনে।"

দক্ষিণে রোয়াং রাজা (১) অর্থাৎ আরাকান রাজ নানা কুস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

কেবল স্বপ্ন নহে, দিনে শৃগালের ডাক, অহর্নিশ শকুনি প্রভৃতি উড়িতেছে; বেড়াইতে বাহির হইলে শব দর্শন ইত্যাদি নানা অমঙ্গল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। একদা তাঁহার জলপূর্ণ ঘটী হইতে কুকুর আসিয়া জল খাইয়া গেল। এইরূপে নানা অশুভ চিহ্ন দর্শনে মঘরাজা ব্যাকুল হইলেন এবং কারণ জানিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ ডাকিলেন। দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন:—

"(বজ লগে বুধবারে)
জন্মেয়ে শত্তুর উত্তরে।"

'উত্তরদিকে শত্রু জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

ইহা শুনিয়া মঘরাজ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং গোপনে শত্রু-বিনাশের জন্য অনেক পারদর্শী দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সে শত্রুর কোনও সন্ধান পাইল না, অধিকন্তু রাজাকে আসিয়া নিরাপদ আশ্বাস দিল। রাজাও তাহাতে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

এদিকে যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহনকে অগ্রে পাঠাইয়া অবিলম্বে তিনি স্বয়ংও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কালাবাঘা প্রদেশে তদীয় শিবির সংস্থাপিত হইল। যুবরাজকে তথায় রাখিয়া রাধামোহন সৈন্য সামন্তগণসহ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইতে যাইতে বলিতেছে:—

"(গেলুং ছরায় নে উজানি,)
মঘদেশ কুহু আগে কি জানি?"

হরায় উজানাভিমুখী যাইতেছি, কিন্তু সীমা পাওয়া যাইতেছেনা,—মঘদেশ যে কোথায় আছে, কে জানে!

---

(১) প্রকৃত শব্দ রোহং—রোয়াং—বর্ত্তমান আরাকান।

"(মানেক বেগানা জল্‌জলি),
কত সৈন্য কত্তন কল্‌কলি।"

কতকগুলি সৈন্য কোলাহল করিতেছে।

"(তামা পিদোল কেচ্‌তন্‌ দে,),
কত সৈন্যগণ এত্তন্‌ দে।"

কত যে অর্থাৎ অগণিত সৈন্য আসিতেছে।

"(তোনে রাণিনি ভাত খেলাক্‌)
সমুদ্র সাগর নি লাগ পেলাক্‌।"

(অবশেষে) সমুদ্রতীরে আসিয়া সকলে উপনীত হইল।

সেনাপতি বলিতেছেন :—

"(আগুণং দিলে ঘি গলে,)
সমুদ্র পার হবং গম দোলে।"

'সুবিধা মতই সমুদ্র পার হইব।'

কবি দেখিলেন :—

"নাজের উল্লাসে রাধামন
কৈগাং পলাক্কি সৈন্যগণ।"

সৈন্যগণ কৈগাং নদীতীরে উপস্থিত হইলে রাধা মোহন আনন্দে নাচিতে লাগিলেন।

অনন্তর মঘরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করা হইল। সংবাদ পাইয়া মঘরাজা অস্থির হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্য পরামর্শের নিমিত্ত মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ করাই মন্ত্রণা স্থির হইল। দূত আসিয়া উত্তর জ্ঞাপন করিলে সেনাপতির আদেশক্রমে—

"(জাদি পুজাং দিলুং ঘি,)
মঘদেশ কূলে সৈন্যগণ পলাক্কি।"

'সৈন্যগণ মঘদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"(পাজারি দোকানৎ ফিটকিদি,)
জাগা নদে মঘরাজা এককিদি।"

'মঘরাজা তাহাদিগকে একটুকু স্থানও দিলেন না।

"(বর্ষিং বাজের ধলবাজা,)
মঘরাজা ক'স্তে কুন্‌ এল কন্‌ রাজা ?"

মঘরাজা বলেন, কোথা হইতে কোন্‌ রাজা আসিল।

অতঃপর রাধামোহনের সঙ্গে মঘরাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কবির ভাষায়

"রাধামনর সা'স ভাঙর,
আস্তে আস্তে চাক্‌মারাজা রাজ্য মারি লর।"

রাধামোহনের সাহস খুব বেশী ; তবলে চাক্‌মারাজা ধীরে ধীরে দেশ জয় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে—

"লৈইন্যায় সমারে সৈন্যগণ,
রোয়াংকূলে লুন্বেগে রাধামন।"

রাধামোহন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রোয়াং কূলে অর্থাৎ বর্ত্তমান আরাকানে উপস্থিত হইলেন।

ইহাতে অতিশয় কুপিত হইয়া

"(ছরাছরিৎ নে গাধিব,)
মঘরাজা ক'ত্তে চাক্‌মারাজাকে কাবিব।"

মঘরাজা বলিলেন, 'চাক্‌মারাজাকে কাটিব।'

কিন্তু—

"(বর্জ্জি বেইন্যায় আধারে,)
রোয়াং রাজা লারেই ন-গরে ;
লারেই গরে পাত্তরে।"

'রোয়াংরাজা নিজে যুদ্ধ করিলেন না, তদীয় পাত্র অর্থাৎ সেনাপতি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।'

(অথ যুদ্ধ বর্ণনা।)

কবি বলিতেছেন :—

"ডাকের তুলি ঘনে ঘন,
মার মার হুকুম দিল দাদা রাধামন।"

দাদা রাধামোহন ভীষণ শব্দে ঘন ঘন চীৎকার তুলিয়া 'মার মার' আদেশ দিলেন।

"গত্তন মঘে লিকৃলিকি,
মঘ-ইন্দি সৈন্য পত্তন্‌দে কমি কি ?"

মঘেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল ; তাহাদের পক্ষে কি কম অর্থাৎ অগণিত সৈন্য পড়িতেছে।

"মঘে গত্তন হাহাকার,
রাজ্য গত্তন চাক্‌মায় মঘের অনাচার।"

চাক্‌মারা মঘদের রাজ্যে অত্যাচার করিতেছে ; মঘেরা হাহাকার করিতে লাগিল।

"পিঝে মঘরাজা হদিল,
রাধামন সমারে ন জিন্‌ল।"

অবশেষে মঘরাজা পরাস্ত হইলেন ; রাধামোহনের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেন না।

"(বর্জ্জিৎ বাজের ধলবাজা,)
তুদি গরি ডাগের মঘরাজা।"

মঘরাজা (রাধামোহনকে) সবিনয়ে আহ্বান করিলেন।

"কহে মঘরাজা রাধারে,
রেজ্য গঝেন্তং তুমারে।"

মঘরাজা রাধামোহন কে কহিলেন, তোমাকে রাজ্য বুঝাইয়া দিতেছি।

"গয়া গজা কল্লুং দান,,
চাংগে তত্তুন্ পরাণ দান।"

গয়া গজা অর্থাৎ সর্ব্বস্বই তোমাকে দান করিলাম; তোমার নিকট (মাত্র) প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি।

তদনন্তর রাধামোহন রোয়াংকুল হইতে স্বয়ং দেশজয় করিতে ছুটিলেন। প্রায় পাঁচদিনে—

"জালি পাগর্য্যা লুমে লাগ,
ছিহু সৈন্তগণ জিরে লাগ্।"

(খ্যয়ং দেশের) জালিপাগর্য্যা নামক স্থানে উপনীত হইয়া তথায় সৈন্তগণ বিশ্রাম করিল।

তখন—

"জাদি পূজাং নে ঘি দিল,
বিজয়গিরি রাজা ধিরাজা জিদিল।"

(যুব) রাজ বিজয়গিরি দুই রাজ্য জয় করাতে ধর্ম্ম-কামে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন।

"রণৎ জিনি বার্ল্যা তেজ,
সিত্তুন গেলাক্ বিলে (১) অক্সাদেশ।"

যুদ্ধে জয়লাভে (রাধামোহনের) তেজ বাড়িল,—অনন্তর তথা হইতে অক্সাদেশ (উচ্চব্রহ্ম) যাত্রা করিলেন।

এখানে অক্সাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। তাহাতে রাধামোহন মূর্চ্ছাগত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, নারায়ণ স্বয়ং বৈষ্ণবেশে আসিয়া তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করেন। সেনাপতির মূর্চ্ছা-সংবাদ লইয়া তদীয় সারথি কুঞ্জধন কালাবাঘা প্রদেশে যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট যায়। তচ্ছ্রবণে বিজয়গিরি বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

রাধামোহনের মূর্চ্ছা।

"ওরে পাত্রগণ কি হব ?
লারেই সদ্দার লারেৎ পোল্ কি হব ?"

ওহে অমাত্য সকল, যুদ্ধের সেনাপতি পড়িয়া গেলেন; উপায় কি হইবে?

অবশেষে যুবরাজ রাধামোহনের উদ্ধারার্থ কুঞ্জধনের সহিত আরও অধিকতর

(১) ঘিলে—পদপূরণে।

সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে সেনাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি নবাগত সৈন্যসমূহকে লইয়া এরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন যে, অবিলম্বে—

"(পিদা ছুবি সিভেল,)
রাধামন তিন রাজা জিদিল।"

রাধামোহন (মঘদেশ, স্বয়ং রাজ্য এবং অক্সাদেশের) রাজত্রয়কে জয় করিলেন।

অনন্তর রাধামোহন অক্সাদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরীদেশ আক্রমণ করিলেন। ইহার বর্ত্তমান নাম কাঞ্চনপুর।

"কাঞ্চন রাজা লারেই ক্ষেমা দিল,
রাধামনে কাঞ্চন নগর জিদিল।"

কাঞ্চনপুররাজ যুদ্ধ করিলেন না, সুতরাং রাধামোহন অনায়াসেই কাঞ্চননগর জয় করিলেন তৎন বলিলেন :—

"এবে জিদিলুং কাঞ্চন দেশ,
ফিরি উল্লা বেড়েংবৈ পুগর দেশ।"

'এখন কাঞ্চন দেশ জয় করিলাম, আবার পূর্ব্বদেশ বেড়াইতে বাহির হইব।'

"পুগে আগে রেজ্য কালঞ্জর,
সে মুখ্যা রাধামন দিল লড়।"

পূর্ব্বদিকে কালঞ্জর অর্থাৎ কুকিদেশ আছে, রাধামোহন তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া—

"কালঞ্জর রাজা কিগল্ল,
পাথরী কিল্লা জুগাল্ল।"

কুকিরাজ কি করিলেন? প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গে প্রস্তুত করিলেন।

পনর দিন ধরিয়া কুকিরাজার সহিত রাধামোহনের যুদ্ধ হয়; অবশেষে কুকিরাজ পরাজিত হন। দিগ্বিজয় ব্যাপার শেষ করিয়া, রাধামোহন যুবরাজ-সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন—

"সে সংবাদ শুনি কি গল্ল,
সিত্তুন বিজয়গিরি রাজা লড় দিল"

রাজা বিজয়গিরি সেই সংবাদ শুনিয়া (কালাবাঘ প্রদেশ হইতে) ছুটিলেন।

"(আদি পুজাৎ দিলুং ঘি,)
মগল দেশৎ পলাকি।"

মগল দেশে অর্থাৎ চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাক্‌মারাজ আসিতেছেন শুনিয়া মঘরাজা শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

"(গাজ-আগ্রাৎ ভদেগ্ খুল,)
লুম্যেটৈগ রাজা সাপ্রেয়োর কূল।"

'(যুবরাজ বিজয়গিরি একিবারে) সাপ্রেয়োরকূলে (ব্রহ্মদেশে) উপনীত হইলেন।

রাধামোহন সাপ্রেয়োরকূলে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইলেন। বিজয়গিরি হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতিকে বিদায় দিলেন। প্রায় বার বৎসরের পর রাধামোহন স্বীয় ভবনে উপস্থিত। ধনপতির গর্ভজাত পুত্র সারাধন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। পুত্রকে বক্ষে করিতে পাইয়া রাধামোহন আনন্দসাগরে ভাসিলেন। ধনপতিও বহুকাল পরে হৃদয়ের ধন হৃদয়ে পাইয়া হৃদয় জুড়াইয়া লইলেন।

রাধামোহনের স্বদেশযাত্রা।

বিজয় গিরির দিগ্বিজয় যাত্রার কিছুকাল পরে বৃদ্ধ রাজা উদয়গিরি কালগ্রাসে পতিত হন। সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, এই ভয়ে কনিষ্ঠ সমরগিরি সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। রাধামোহন প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া রাজা সমরগিরি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাধামোহন রাজসকাশে সমাগত হইলে সমরগিরি তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রথমেই জ্যেষ্ঠ সহোদরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধামোহন তদুত্তরে বিজয়গিরির উপদেশানুসারে বলিলেন :—'তিনি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে নিশ্চয়ই ফিরিবেন।' অনন্তর যুদ্ধের বিবরণ আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে বিজিত রাজ্যের বর্ণনা শেষ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজা সমরগিরি।

এদিকে বিজয়গিরি বিজিতরাজ্যের সুশৃঙ্খলাবিধান করিয়া কথিত অগ্রহায়ণ মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কালবাঘা প্রদেশে আসিয়া শুনিলেন যে, অনেকদিন গত হইল, বৃদ্ধরাজা লোকান্তর গমন করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ সহোদর সমরগিরি সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন। তখন তিনি খেদ সহকারে বলিতে লাগিলেন :—

বিজয়গিরির খেদ।

"(গুলা খোই নাই কুসুমে,)
কি'দোলে জানেইচুং গুরা ভেইয়রে সালামে।

কিরূপে গিয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে সম্মান জানাইব।

"পর্কোয়া পণ্ডিত নেই যে দেশৎ
যেদং নয় সৈন্যগণ সেই দেশৎ।"

'যে দেশে শিক্ষিত পণ্ডিত নাই, হে সৈন্যগণ আর সেই দেশে যাইব না।

"যেই যেই সৈন্যগণ যেই যেই,
ফিরি যেই সাপ্রেয়োর কূলে ফিরি যেই।

'চল সৈন্যগণ চল, সাপ্যোয়োয়কূলে ফিরিয়া যাই।'

এইরূপে বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি সাপ্রেয়োর কূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় সৈন্যগণকে বিজিতদেশবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণে অনুমতি দিলেন এবং তিনি নিজেও অপেক্ষাকৃত উচ্চবংশ-সম্ভূতা রূপে গুণে বরণীয়া এক মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম ও আচারপদ্ধতি অবলম্বনে বসবাস আরম্ভ করিলেন।

ইতি চাটিগাঁছাড়া সমাপ্ত।

অবশিষ্ট "সৃষ্টিপত্তন", "স্বর্ণপালা" এবং ' লক্ষ্মীচরিত্র" পালাও এই ভাবের কবিতাপুঞ্জ মাত্র। কল্পনার তাদৃশ পারিপাট্য না থাকায় এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করিলাম না। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে নানা উপকথাও শুনা যায়, তৎসমুদয়ের 'কিম্ভূত কিমাকৃতিতে' আরব্য-পারস্যোপন্যাসও হার মানে অধিকাংশই রাজা বা রাজকন্যার রহস্য লইয়া অনুস্যূত, তাহার সহিত "রাক্ষসখোক্কসের" বিবরণও বিরল নহে। দুঃখের বিষয় আলোচনার অভাবে ঐ সকল কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে! অমরলেখক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় উপন্যাস প্রবাহে যে হিল্লোল তুলিয়াগিয়াছেন, সমাজ তাহারই আন্দোলনে আত্মহারা! বিচার-বিবেচনাহীন বালকের দল যুবক-যুবতীর সেই সব প্রেমগাথা পড়িতে পড়িতে অকালপক্ক হইয়া উঠিতেছে এখন আর ঠাকুরমার মুখের অনাবিল "আষাঢ়ে গল্পে" মনোযোগ যাইবে কেন? সেই কারণে হতাশ্বাস হইয়া এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে এস্থলে "জামাই মারণী" এবং "গোমতী নদী"র বিবরণ গর্ভ দুইটী মাত্র ঐতিহাসিক কাহিনী প্রদান করিতেছি, জানি না ইহারা পাঠকবর্গের কতদূর অনুগ্রহ লাভ করিবে।

জামাই মারণীর গল্প।

"আক্‌করি (১) এক রাজা এইল (২) তাথুন (৩) এককোয়া (৪) খুব. দোল্ (৫) ঝি এইল্। তার দোল্ সম্বাদ্ দেজে (৬) দেজে রাষ্ট হোল্, আমাত্যসকল্ লগর্ (৭) গাভূর্ (৮) গাভূর্ পোয়া-লগে (৯) তারে লভার্ত্থাই (১০) ছট্‌ফদি লাগিলাক্, পরে রাজা ঠিক্-গরি দিলদে (১১), একখান্ টারেঙ্ (১২) মাদাত্তুন্ (১৩) যে ঝাম্ দিনলাই (১৪)—

(১) প্রাচীনকালে, (২) ছিল, (৩) তাহার নিকট, (৪) একটী, (৫) সুন্দর, (৬) দেশে, (৭) অমাত্য সকলের (৮) যুবক, (৯) পুত্রের সঙ্গে, (১০) লইবার অর্থাৎ বিবাহ করিবার জন্য, (১১) দিল যে, (১২) পর্য্যন্ত শৃঙ্গ; ইহা "জামাই মারণী" আখ্যায় কর্ণফুলী উত্তরতীরে সীতাপাহাড় ডয়েষ্টরিজার্ভের অন্তর্গত চিৎমরং নামক স্থানে উপরি উক্ত ঘটনা সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত। যতকাল

বড় গাঙৎ পড়ি নাই (১), সাজুরি নাই (২) উকূলে পার হই পারিব, তারে তা-ঝিরোয়ে দিব। কতজনে (৩) ঝাম্ দি দি মলাগ্ (৪); শিজে (৫) এক দিস্থা এক রাজা-পোয়া এই নাই (৬), রাজা-ঝিরে পেবাস্তাই (৭), ঝাম্ দিদ চেল (৮), রাজা তারে ছিঁ'স্থা (৯) ঝাম্ দিবার নদিল; তার্ পর দিস্থা ঝাম্ দিবার কদা (১০) হল্। রেদোৎ (১১) রাজা সপনে দে'ল দে, একোয়া বুড়ী এই নাই, রাজারে বুদ্ধি শিগেই (১২) দিলদে, বুগৎ-পিদৎ ও দিহাদৎ (১৩) দ্বিবা বালোজ্ বানি (১৪) দিজ্, আর্ হাদৎ একোয়া ছাদি (১৫) ধরিনাই দিরি দিদ কোচ্ (১৬)। এই কই' নাই সেই বুড়া মিলাবোয়া (১৭) অদেগা (১৮) হোল্। বেইন্সা (১৯) ঘুমত্তুন্ উদিনাই (২০) রাজা পোয়াবোয়া (২১) রাজা-কদা-দগে (২২) বালোজ্ বানি নাই ঝাম্ দিল। ঝাম্ দি' নাই সাজুরি নাই বড়গাং পার্ হই নাই এইল্। রাজা খুজী (২৩) হই নাই, সেই রাজাপোয়াবোয়ারে তা' ঝিয়োরে দিল।"

এই উত্তুঙ্গশৃঙ্গ কালকুক্ষিতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন এই কাহিনী ঘুচিয়া যাইবার নয়। তাহাতে আবার বন্ধুবর সুকবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত মহোদয় কবির ভাষায় যে এই অপূর্ব্ব "প্রেমের সাধনা" বঙ্গভাষার দপ্তরে খতিয়া রাখিয়া (আলোচনা নামক মাসিক ৯ম সংখ্যা, ১৩১৫ দ্রষ্টব্য তাহার স্থায়ীত্ব আরও দৃঢ় করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে অন্ততঃ শেষ শ্লোকটী এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথা,—

"নাজানি এ কবের কথা কে কহিবে হায়,—
'জামাই মারা' পাহাড় ঘেরে
তেমনি ভাবে বিরাজ করে
নদী কিনারায়।
জাগেগো কত ব্যাকুলতা
আজো দেখে তায়।"

"এন্তে (২৪) এক বুর্য্যা। তে এদগ (২৫) আল্জি (২৬) যে, কলা তারৎ (২৭) এরেই (২৮) ন খায়। তাত্তুন (২৯) দ্বিবা (৩০) ঝি এলাগ (৩১)। বুর্য্যা তারাল্যায় (৩২) একথান্ জুম কাবি দিনাই (৩৩) কিছু ন গত্ত (৩৪)। একদিন কালবৈশাগী

(১৩) শীর্ষ হইতে, (১৪) ঝাঁপ দিয়া, (১) পড়িয়া, (২) সাঁতারিয়া, (৩) কত জনে, (৪) মরিলেন, (৫) শেষে, (৬) আসিয়া, (৭) পাওয়ার নিমিত্ত, (৮) ঝাঁপ দিতে চাহিল, (৯) সেইদিন, (১০) কথা, (১১) রাত্রিতে, (১২) শিখাইয়া, (১৩) বুকে পিঠে ও দুই হাতে, (১৪) দুইটী বালস বাঁধিয়া, (১৫) ছাতি, (১৬) কহিও, (১৭) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী, (১৮) অদৃশ্য (১৯) প্রভাতে, (২০) ঘুম হইতে উঠিয়া, (২১) রাজপুত্রটী, (২২) রাজার কথামতে, (২৩) খুসি।

(২৪) অর্থ, (২৫) এত যে, (২৬) অলস, (২৭) পর্য্যন্ত, (২৮) বাকল ছাড়াইয়া, (২৯) তাহার (৩০) নিকট দুইটী (৩১) কন্যা ছিল, (৩২) তাহাদের জন্য, (৩৩) দিয়া, (৩৪) আর কিছুই করিত না,

গোমতী নদীর কথা।

মিনং বগল ত্তা' খিবা ঝি জুমং ধান কুজিদাগ্ (১) জেইয়ন্ (২), বেল্ (৩) কদ্দুর জেইনাই (৪) দেবা (৫) আঁধার্ধ্যা্ কালা গরটৈগ (৬), চের-কেইত্তাত্তুন্ (৭), ব (৮) বেদ (৯) লাগিল্। তারা থেবা (১০) জাগা নেই দেই নাই (১১) কপাল ঝিনেই ঝিনেই (১২) কান্দাগ্ লাগিলাগ্। দাঙবেঁায়া (১৩) কয়দের (১৪),সাব্ (১৫) হোগ্ বেঙ্ হোগ্, ম্ভ (১৬) হোগ্, দেবতা হোগ্, ভূত হোগ্ পেরেৎ হোগ্ রাজা হোগ্, রেইয়ৎ হোগ্, যে আমারে ইখ্যে (১৭)একখান্ ঘর তুলি দিব,মুইতার লোম্ (১৮)। সিয়াণ (১৯) শুনি নাই এক্কোয়া বড় সাবে রাজ ভার্ (২০)বোই নাই (২১)তারা তায় একখান্ ঘর তুলি দিল। তারা খি বোনত্তুন্ (২২) দাঙর্ বোন্ নোয়াই (২৩) সে সাব্বোয়ারে লল (২৪)। তারা-বাবে (২৫)—বুর্য্যায় সেই কদা (২৬) শুনি নাই সেই সাব্বোয়ারে কাবি ফেল্ল। তা-ঝি য়ে (২৭) কান্দে কান্দে চোগ-পাণিয়ে (২৮) ঘরা জেই চাই (২৯) সেই ছরা-পানিৎ ডুবিনাই মর্যো। সেই ছরান নাং (৩০) গোমেদ্ গাং। ত্তিবিরা রাজা পোয়ায়ই (৩১) সাব বেজ্ (৩২) ধরিনাই তারাত্তায় ঝিগে ঘর তুলি স্তে-টৈগ (৩৩)।”

[২]

বারমাস।

প্রাচীন সাহিত্যভাণ্ডারে “বারমাস” একটি আদরের সামগ্রী। কবির কবিত্ব ইহাতে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার সুবিধা ছিল। বারমাসের অবকাশও সুদীর্ঘ, এই অবসরে কবি মনের যাবতীয় পিপাসা মিটাইয়া লইতেন। সচরাচর নায়িকার মনোব্যথা লইয়াই ইহা গ্রথিত হইত; বঙ্গীয় ললনাগণ বারমাসের উপর্য্যুপরি লাঞ্ছনায় ঝালাপালা হইয়া মনের উচ্ছ্বাসে “বারমাস” জুড়িয়া দিতেন। এই সকল হিন্দু অবলার ‘বারমাস’ও চাক্মা-সমাজে যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজস্বও কম নহে। “কির্ঝাবি’র বারমাস,” “শেষ্যোয়া কন্যার বারমাস”, “তান্যাবির বারমাস”, “রাঙ্গনমালার বারমাস”, “কালিন্দীরাণীর বারমাস” ইত্যাদি কতই আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্তখানি আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। পাঠক দেখিবেন, ইহার ভাষা যদিও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা নহে, কিন্তু তজ্জন্য যেন প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে। মূল চাক্মা ভাষার তুলনায় ইহার ভাষা বহুপরিমাণে মার্জ্জিত। যথাঃ—

---

(১) রোপণ করিতে, (২) গিয়াছিল, ৩) বেলা, (৪) কতদূর গেলে, (৫) দেবতা এখানে আকাশ, (৬) কাল অর্থাৎঘোর অন্ধকার করিল, (৭) চারিদিক হইতে, (৮) বাতাস, (৯) বহিতে, (১০) থাকিবার, (১১) দেখিয়া, (১২) করাঘাত করিতে করিতে, (১৩) বড়টি, (১৪) কহিল যে, (১৫) সর্প, (১৬) দেব, (১৭) এখন, (১৮) আমি তাহাকে লইব অর্থাৎ বিবাহ করিব, (১৯) সেই কথা, (২০) বাঁশের ন্যায়, (২১) বহিল, (২২) দুই ভগ্নী হইতে, (২৩) জ্যেষ্ঠটাই, (২৪) লইল অর্থাৎ বিবাহ করিল, (২৫) তাহাদের পিতার (২৬) কথা, (২৭) তাহার কন্যা, (২৮) চক্ষের জলে, (২৯) ছরা বহিয়া যাইয়া, (৩০) ছরাটির নাম, (৩১) ত্রিপুরা রাজপুত্রই, (৩২) সর্পের বেশ, (৩৩) দিয়াছিল।

কির্ব্বাবি' (কৃপাবিবি)র বারমাস।

কার্ত্তিক মাসেতে কির্ব্বা বৃক্ষপত্র ঝরে।
ধর্ম্মফলে জন্ম হৈল সুন্দরী-বাপের (১) ঘরে॥
পুত্রের সমান করি মারে বাপে পালে।
হেন দুঃখ দিল কির্ব্বা শরীর-অন্তরে॥
হেন মতে পালে যেন কন্যা রত্নমালা।
দিনে দিনে বাড়ে যেন পূর্ণ চন্দ্রকলা॥ ১।
আগ্রণ মাসেতে কির্ব্বা কুরঙ্গ নয়ানী।
কান দু'টী বরুণ তার ক্ষীণ মাজাখানি॥

* * *

* *

চন্দ্রের সমান মুখ নাসিকা তিল ফুল।
দেখিতে সুন্দর (অঙ্গ) কন্যা রতনের মূল॥
খঞ্জন গমনে হাঁটে কির্ব্বা চন্দ্রমুখী।
গৃধিনী সাবাশে কর্ণ ক্ষীণামাজাখানি॥ ২।
পৌষ মাসেতে কির্ব্বা শীতে পরে ধারে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দিনে দিনে বাড়ে॥
"আতুরা" (২) জন্মিল যদি লাক্‌মনের ঘর।
কির্ব্বাবি'র মিলন কথা শুন সর্ব্ব নর॥
খারি কাবা নদী ছিল পূর্ব্বে আর উত্তরে।
দৈববোগে গেল কির্ব্বা সেই নদীকূলে॥
সেই দিন আতুরার সঙ্গে দরশন।
দুই জনে যুক্তি করি প্রবেশিল বন॥ ৩।
মাঘ মাসেতে কির্ব্বা মনে করি সার।

* * *

* কৌতুক করি দিল আলিঙ্গন।
দুইজনে যুক্তি করি প্রবেশিলা বন॥
কত দিন ভ্রমিয়া কন্যা জঙ্গল মাঝার।
ঘরেতে আসিল কন্যা লোকেতে প্রচার॥

(১) সুন্দরী নারী যুবতীর পিতার (২) অলস অর্থাৎ কুড়ে কিশোরের আখ্যা।

আমুলুকে মিলি করি (৩) যুক্তি করি সার।
বাড়াইয়া দিল কন্যা ঘরে আপনার ॥ ৪।
ফাল্গুন মাসেতে কির্ব্বা ফাউ (৪) খেলে দোলে।
ত্রিপুরাছরী দুয়ারে নিল সালিশ করিবারে ॥
সভাতে বসিয়া কন্যা উঠিল দঢ় (৫) হইয়া।
জয় খিসা (৬) হুকুম দিল কন্যা দেগৈ বিয়া ॥
সর্ব্বলোকে মিলি যদি বিয়া দেগৈ কোইল (৭)।
জয়চন্দ্র খিসা উঠি কিছু না বলিল ॥
বহুমূল্য ধন দিয়া তুলি নিল বাপে।
রহিতে নপারে কির্ব্বা মনের অনুতাপে ॥ ৫।
চৈত্র মাসেতে কির্ব্বা রৌদ্রেতে হরাণ (৮)।
বুঝাইতে নাহি পারে কন্যার পরাণ ॥
ভীম-সুত গলে দিয়া জলেতে গমন।
তবে সে পাইব আমি প্রভু দরশন ॥
রামেরে হারাইল যদি সীতা মহাদেবী।
সেই মতে হারাইল কির্ব্বা গুণনিধি ॥ ৬
বৈশাখ মাসেতে কির্ব্বা বৈসে তরুতলে।
ছাড়িবারে না পাইলুম প্রভুর মায়াজালে ॥
রহিবারে না পাইলুম ভাইবন্ধু ঘরে।

* * * *

নিত্য নিত্য কৃষ্ণসুতে দহে রাত্রিদিনে।
কেমনে ছাড়িয়া গেল কন্যা সুবদনে ॥

(ত্রিপদী।)

অষ্টসীতা বলে পুনি, কোথা যাব সুবদনী
তত্ত্বকথা (৯) কহি শুন সার।
কন্যা বলে সুবদনী নিবেদন করি আমি
সত্য কথা কহি শুন আর ॥
জ্ঞাতিবন্ধু ঘরে রৈলুম বহুদুঃখ মনে পাইলুম
শুন প্রভু করি নিবেদন।

(৩) মিলিত হইয়া; (৪) হোলির উপকরণ—আবির নামে খ্যাত; (৫) শক্ত; (৬) ব্যক্তিবিশেষের নাম; (৭) কহিল; (৮) পরিশ্রান্ত; (৯) বিষয়বাক্য।

অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া　　অনলেতে প্রবেশিয়া
তবে প্রভু পাব দরশন ॥
আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র　　উলমস্থ চন্দ্র　　*
গৌরচন্দ্র রোহিনী চন্দ্র করিমু যে পান।
কৃষ্ণসুতে সহিল .　　উত্তর না দিয়া গেল
তবে পাইব প্রভুর উদ্দেশ *
এত দুঃখ না সয় শরীরে
বালিসুতে জরজর　　কাঁদি আমি নিরন্তর
কোন মতে পাইমু প্রভু দরশনি।
অষ্ট সীতা বসাইল　　নানা যুক্তি দেখাইল
সে অঞ্চলে কন্যা সুবদনী ॥
কন্যা বলে অষ্টসীতা　　অষ্টশিব মোর পিতা
ন কহিও কভু আত্ম　　*
কন্যা কথা না কহিও　　অঙ্গে অনল জ্বলিও,
তবে (মোর) পিতা হবে বধভাগী ॥

(পয়ার।)

আঙু পারজ্যা আর সীতা চরণে শ্বশুর।
বাড়াইয়া দিল কন্যা আর কতদূর ॥
হেন মতে না কহিও তত্ত্বকথা সার।
অবশ্য হইবে জান লোকেতে প্রচার ॥ ৭।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে কির্ব্বা পূরে মনোরথ।
অষ্ট সীতা দেখাই দিল সেই নিজপথ।
সেই দিন গেল জান সেলচ্‌ছরী-থুমে (১০)
কতদিন রাখিল কন্যা তন্ত্রাপারা লোকে ॥
'পাজাচথা' নদী ছিল নাকুন নন্দিনী।
তার ঘরে গুপ্তবেশে রৈল (কন্যা) সুবদনী ॥
কত দিনে তার পিতায় করিল উদ্দেশ।
উদ্দেশ না পাইয়া আইল আপনার দেশ ॥৮।
আষাঢ় মাসেতে কির্ব্বা মনে নাহি সুখ।
কন্যা হইয়া পিতায় এত দিল দুখ ॥

(১০) সেলচ্‌ছরী নাম্নী স্রোতস্বতীর উৎপত্তিস্থলে।

পুনর্ব্বারে সেই কন্যা আতুরায় পাইল।
বিচিত্র তনয় যেন * ভূঞিল॥
আতুরায় বলে শুন (প্রিয়া) এথায় কেনে আইলা।
ব্যাঘ্র ভয়ে আর তুমি কেন না ডরাইলা॥
কির্ব্বায় বলে ভক্তি আছে মোর মনে।
লাচারী প্রবন্ধে মুই দুঃখ বিবরণে॥
(ত্রিপদী।)
একেশ্বরী চলিলুম বহু দুঃখ পাইলুম
তারে কহিলুম বাণী *
মোরে দুঃখ ডাকিছিল নানা যুক্তি তবে দিল
তবে চলে সেই নিজ পথে॥
জঙ্গল কানন ভ্রমিয়া ছাড়ি আইলুম নিজ'পরি রহিয়া
সঙ্গে নাই কোন জন মোর।
দিল প্রভু আলিঙ্গন সন্দে (১১) ছিল মোর মন
জুড়াই গেল অঙ্গ শরীর॥
পূর্ব্বফলে জন্ম হইলুম ধর্ম্মফলে তোরে পাইলুম
তবে মোর পূর্ণ হইল মনে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি রাত্রি দিন কাঁদি আমি
নিদ্রাকালে দেখিলুম স্বপনে।
তুমি মোর নিজ বন্ধু তরাইবে ভবসিন্ধু
তবে তুমি হইওনিজ পতি।
আতুরায় বলে * * *
গুণনিধি বিধাতায় মিলাইল আনি।
বাপে তোরে তুলি নিল বিধাতায় বিমুখিল
তোর লাগি আর নাহি জানি॥
সীতা হারাইল রাম না পুরাল মনস্কাম
উদ্ধারিয়া নিজরাণী লইল।
সেই মতে তোরে পাইল কামানলে দহিছিল
রাত্রিদিনে করি রাজকেলি॥
সদায় আনন্দময়ে কৃষ্ণসুতে নিশি।
কির্ব্বায় বলে অইসায় ন পুরাইলাম পুনর্ব্বার.
হারাইলে না পাইব *॥

(পয়ার।)

এই মতে আতুরায় নিজ কন্যা ? পাইল।
শিশু পাইয়া ইন্দ্র যেন আনন্দ হইল ॥ ৯।
শ্রাবণ মাসেতে কির্ব্বা খালে নালে পানি। ১২।
পূর্ব্ব ফলে বিধাতার মিলাল যে আনি ॥
দূর চাঁদ ধরা পাইল যেন সফল সরস্বতী।
হেন মতে পাইল আতুরায় কির্ব্বা গুণনিধি ॥
বিভীষণে পাইল লঙ্কা রাবণার শেষে।
কন্যা লইয়া আতুরায় যাইব কোন দেশে ॥
মুনি বাপ বুদ্ধি পাব তনু কর্‌ল্যা ক্ষীণ।
ঠাগুর্‌জ্যার ঘরে আনি রাখে কতদিন ॥ ১০।
এই ভাদ্রমাসে কির্ব্বা রূপে গুণে ধন্যা।
'বগাছরী থুমে' নিয়া রাখিলেক কন্যা ॥
পুরুষের বেশ ধরি চলে কন্যা খালি।
হাঁটিতে না নড়ে পা খঞ্জনের মুখী ॥
নিল দশ প্রিয়া লাগি আছে অঙ্গে।
দুই জনে চলি গেল বুড়াবুড়ী সঙ্গে ॥
সুন্দর খঞ্জন কন্যা দুই চক্ষু লাল।
পুত্রবন্ধু ঘরে রাখিতে পাইল জঞ্জাল ॥ ১১।
আশ্বিন মাসেতে কির্ব্বা পুষ্পরসে মেলা।
আতুরায় পাইল যেন চিকনিয়া কালা ॥
যেবা গায় যেবা শুনে কির্ব্বা-বারমাস।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥ ১২ ॥ সমাপ্ত।

এই বার মাসের একখানি মাত্র প্রাচীন হস্তলিপি আমি বহু যত্নে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার করিয়া উপরে প্রকাশিত হইল। উহার স্থানে স্থানে আমার মর্ম্মস্ফুট হয় নাই, বহু প্রাচীন ব্যক্তিও হার মানিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গকে অধিক আর কি কৈফিয়ৎ দিব! অপর কথা মূল 'বারমাস'খানি বর্ণাশুদ্ধিতে জর্জ্জরিত, তাহাতে পাঠকবর্গের অর্থোপলব্ধি করিবার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইত। তাই আমি উদ্ধৃত করিবার কালে অধিকাংশ

(১১) সন্দেহ. (১২) জল।

স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া লইয়াছি। তথাপি স্থানে স্থানে অর্থভেদ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় লিপিকরের অনভিজ্ঞতার ফল। 'বারমাস'খানির ভাষা ও রচনাচাতুর্য্য বস্তুতই প্রণিধান যোগ্য। ইহা যে অপরাপর বাঙ্গলা বার মাসের অনুকরণে লিখিত ও আধুনিক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও বর্ত্তমানেরই অদূরবর্ত্তী এই কির্ব্বার সুন্দরী, আতুরা, অষ্টসীতা বা জয়চন্দ্র খিসা ইত্যাদি কাহারও পরিচয় পাওয়া গেল না। 'বারমাস' খানির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চাক্‌মাদিগের জাতীয় কাহিনী নিহিত রহিয়াছে। কিরিবা বিবি ও আতুরার প্রেমাভিনয় চাক্‌মা সমাজে অদ্যাপি প্রায়শঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। পরিশেষে কবি তদীয় কাহিনীর গৌরব বাড়াইতেন—

"যেবা গায় যেবা শুনে কির্ব্বার বারমাস।
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥"

কথায় উপসংহার করিয়াছেন। বারমাস রচনায় ইহা এক নূতন আশ্বাস বটে!

[৩]

যখন আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ থাকে, সঙ্গীতের বিশ্ববিমোহিনী ক্রীড়া উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে না, ততদিন যাবৎ এই ছড়া মাত্র সম্বল লইয়া আমরা প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ পরিব্যক্ত করি। হায়! সেই ছড়া গাইতে গাইতে বা শুনিতে শুনিতে যে কি উদার আনন্দে আত্মহারা হইতাম, আর তাহা স্মরণ করিতেও প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে! সেই অতীত ও বর্ত্তমানে যেন—যুগযুগান্তর। আর, সেই 'অতীত সুখের দিনে—পুনঃ আর ডেকে এনে' কি হইবে? ঐ দেখুন, বিমল কৌমুদী তলে দাঁড়াইয়া চাক্‌মাজননী সুকোমল হস্ত প্রসারণে ক্রোড়স্থ শিশুকে আকাশের চাঁদ আনিয়া দিতেছে, এবং সুর-লয় সহযোগে চন্দ্রের আবাহন করিতেছে;

ছড়া। (১)

'আয় চান্ এলাদে—মেলা দে,
ভাঙা কুলা নোয়ান (১) দে।
গরুয়ে বিয়াইয়ে ধল ডেগা (২);

(১) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত বঙ্গভাষার মূল্যবান ছড়াসমূহ কালের কুক্ষিতে লয় পাইতেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'থুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করিয়া তৎসমুদয় রক্ষার এক আদর্শ ঝুড়ি উন্মুক্ত করি দেখাইয়াছেন, তৎপ্রতি সাহিত্যসেবক মাত্রেরই কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়। 'পরিষদের' অন্যতম হিতৈষী 'চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া'র সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয় ও এজন্য ধন্যবাদের পাত্র।

(১) নয়খানা; (২) সদা বাছুর;

খল ভেগাবোয়া ন খায় দুধ।
লক্কর মাথাৎ (১) সোণার টুপ ॥"

আবার কোথায়ও বা জননী সন্তানকে দোলাইয়া দোলাইয়া 'ঘুম পাড়ানিয়া' গাইতেছে ;—

"অলি—অলি—অলি,
বাঁশপাতার ঝলি (২) ;
বুর্য্যা (৩) বাবা ঘুম যায় (৪) সোনা-ধুলনৎ (৫) পড়ি"
"সোনা-ধুলনৎ রূপার দড়ি,
বুর্য্যা বাবা ঘুম যায় সোনা-ধুলনৎ পড়ি।" ২।
"হাদৎ লয়ে বাদোল বাঁশ (৬),
কুয্যাৎ (৭) লয়ে গুলি,
বুর্য্যা বাবা মারি আনি দিবগৈ বনর পাখী।" ৩।

(খেলা দেওয়ার ছলে,—)

"উন্দুরে গত্তন কজমজ (৮),
বিলেই (৯) আগে বই—
বুর্য্যা বাবা ঘুম যায় সোনার ধুলন লই।" ৪।
"আলু পাতা তালু রে
কুচ্ছ্যাল পাতা লং (১০);
ববুনাগৈ ববুনি ন এচ্ছ্যালং।
ম্যাজাক্ ছ-গুণে (১১) ঘুঁৎ ঘাঁৎ গরতন্দে,
নয়ন ঘর ভিদিয়ে (১২) ভালুক কেশ,
এসয়ে বাপমা চলয়ে দেশ।" ৫।

(আবার ক্রন্দনের সান্ত্বনায়—)

"এ কূলে কলাগাছ, ওকূলে ছরা ;
পরাণ্যা বাবা (১৩) ন কানিজ্ (১৪) ভাঙিব গলা।" ৬।
বাবা বুর্য্যা ন কানিজ্ তুই,
বাঙালে (১৫) কলা মলা আন্নে
নৈ দিবৈ (১৬ মুই।" ৭।

(১) লক্ক বাবার মাথা ; (২) বেড়া ; (৩) বুড়া (স্নেহসূচক আহ্বান) (৪) যাইতেছে ; (৫) স্বর্ণ দোলনায় (৬) কান্ঠা ; (৭) কোচড়ে ; (৮) ইন্দুরে কিচিমিচি করিতেছে ; (৯) বিড়াল ; (১০) ইক্ষুপাতা লম্বা ; (১১) শাবক সকলে ; (১২) ভেদ করিয়া ; (১৩) প্রাণের বাছাধন ; (১৪) কাঁদিস্ না ; (১৫) বাঙ্গালী (ব্যবসায়ীরা) ; (১৬) লইয়া (ক্রয় করিয়া) দিব ;'

"দারু (১) তুলি জারীফুল (২) ;
ন কানিজ্ বাবুধন
রেঙ্গুন স'রখুন (৩) ত-বাবে (৪) আনি দিব
নারিকুল (৫)।" ৮।

'হাদৎ লয়ে বাদোল বাঁশ
কুশৎ লয়ে ম্যাং (৬),
বুর্য্যা বাবা ন কানিজ্ অলি ডাগি ত্তং (৭)।" ৯।

(ক্রন্দন থামিতেছে না দেখিয়া ভীতিমিশ্রিত স্নেহে—)

"জাদু ঘুম যারে তুই,
পুরাণ কাল্যা (৮) হস্তী এচ্ছো (৯)
মাতাই আইয়ম্ (১০) মুই ,
জাদু ঘুম যারে তুই।" ১০।

"ঘরর পিছে (১১) লাল খাগারা (১২)
মাথায় মুথুর্ করে ;
হাল্যা ঘরের (১৩) কাল্যা কুর্ত্তা (১৪),
কেম্বন কেমন করে।
জাদু ঘুম যারে তুই।" ১১। ইত্যাদি।

আবার কোথায়ও বা চাক্‌মা-ছেলের দল 'বৃষ্টি প্রার্থনা' করিতেছে :—

"দেরে দেবা (১৫) দেরে ঝড় (১৬),
গাজর আগায় আগায় (১৭) পানি গর (১৮)।
কলা কাবি (১৯) গর দে,
মামু (২০) দেবার ঝড় দে॥"

এ সব ছাড়া ছেলে-মেয়েদের অর্থহীন "বিহুতি কথা" ও যথেষ্ট। নমুনা যথা :—

"পদ্মাবতী চরণে,
আমা-বুর্য্যা মরুণে,
ধান তলইবা (২১) রাখইয়া (২২) নেই ;

---

(১) ঔষধ ; (২) বৈদ্যকদ্রব্য ; (৩) সহর হইতে ; (৪) তোরবাপরে ; (৫) নারিকেল ; (৬) গুলি ; (৭) ডাকিয়া দিতেছি ; (৮) প্রাচীন কালের ; (৯) আসিয়াছে, (১০) সাক্ষাৎ করিয়া আসি। (১১) ঘরের পশ্চাতে ; (১২) জঙ্গল তৃণ বিশেষ ; (১৩) চাষার ঘরের , (১৪) কালা কুকুর ; (১৫) মেঘরাজা (এখানে আকাশ) ; (১৬) বৃষ্টি ; (১৭) বৃক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ; (১৮) জল কর ; (১৯) কাটিয়া ; (২০) মাতুল ; (২১) ধান শুষ্ক করিবার চাঁজ বিশেষ ; (২২) রক্ষা করিবার।

জোগরা (১) কুম্মোয়া (২) খেইয়া নেই ;
রাজা-পোয়া (৩) মর্য্যান্ দে (৪)
কানাইয়া (৫) নেই ;
শণফুল ফুট্যান্‌দে (৬) তোলইয়া (৭) নেই।" ১।

"চল্ খুৎ খুৎ চল মুঝি (৮),
চল্ কুলা লৈ (৯) বেড়াল্লৈ (১০) মুঝি ;
কাপড় চোপড় ভুডি (১১) বান (১২),
ও'মানিক চাঁন, ধুদুপ (১৩) আন।" ২।

"দিম্ দিম্ (১৪) বিয়ালে (১৫),
না ক্কোয়া (১৬) নিল শিয়্যালে (১৭),
সে নাকোয়া কদক দূর (১৮),
বড় গাং কূলর (১৯) দগিন কূল (২০) ;
দগিন কূলং 'অরা' বাঁশ,
ঘর তুলি' (২১) দিম্ আগন মাস (২২) ;
আগন মাসর 'কর্কডি' বেঙ্,
বাবনা (২৩) নিল গরুর ঠেং।" ৩।

(তেং তেয়রীর "গান" :—

"তেং তেয়রি তেং তেয়রি (২৪),
বাড়া বান (২৫) ;
কার্য্যা চোলর (২৬) ভাত দ্বিবা (২৭) রান (২৮)।
রাম্বে রাম্বে (২৯) চাম্পাফুল,
চাম্পা মত পড়ে ;
দাদা ভুজি (৩০) ঘরৎ(৩১) নেই
সোনার নাথেঙা (৩২) জ্বলে।

(১) মদবিশেষ, (২) মদের কলসী ; (৩) রাজপুত্র ; ৪) মরিয়াছে যে ; (৫) কাঁদিবার লোক ; (৬) ফুটিয়াছে ; (৭) তুলিবার লোক ; (৮) মায়ের কনিষ্ঠাভগ্নী ; (৯) (চাউলাদি ঝাড়িবার) কুলা লইয়া ; (১০) বেড়াই গিয়া ; (১১) পুট্‌লী ; (১২) বাঁধ ; (১৩) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ ; (১৪) দিব ; (১৫) বৈকালে ; (১৬) নাকটী ; (১৭) শৃগালে ; (১৮) কতদুর ; (১৯) নদীতীরের ; (২০) দক্ষিণ পাড় ; (২১) ঘর উঠাইয়া ; (২২) অগ্রহায়ণ মাস ; (২৩) ব্রাহ্মণে ; (২৪) তেংতেয়রী—কীট বিশেষ, (২৫) ধানভান, ; (২৬) ছাটা চাউলের ; (২৭) দুইটী ; (২৮) রন্ধন কর ; (২৯) রাঁধিতে রাঁধিতে ; (৩০) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ ; (৩১) ঘরে ; (৩২) কর্ণাভরণ বিশেষ।

ভুজি যিয়ে (১) ভাত চরা (২),
দাদা যিয়ে মঘপাড়া ;
দাদার মোগর (৩) দীঘল চুল,
বান্‌থে বান্‌থে চাম্পাফুল ;
চাম্পাফুলর তলে,
দ্বিবা (৪) হরিণ লড়ে ;
হরিণ নয় চোঙরা (৫),
চোখর পাতা (৬) ভোমরা।” ৪।

এই গেল শিশু বা বালককালের কৌতুকলহরী। ইহার সঙ্গে কর্ম্মীদিগের একটি কর্ম্মসঙ্গীতের নমুনাও প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই ছড়াটি পাহাড়ী জুমিয়াদের বিশেষতঃ যাহারা “কাট্টন” করে অর্থাৎ কাঠ বা নৌকা কাটে, তাহাদিগের প্রায় নিত্য প্রয়োজনে আইসে। গাছ টানিতে ও তুলিতে সুরলয়যোগে ইহার আবৃত্তিতে বড়ই জোর পাওয়া যায়। ইহা একদিকে যেমন উৎসাহ বৃদ্ধি করে, অপর দিকে তেমনই সুরলয়ে সকলেরই বল যুগপৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই ছড়ায় সহজেই অল্পবলে অধিক কাজ আদায় করা চলে। ইহাতে দলপতি দলের সকলকে সাবধানপূর্ব্বক উত্তেজিত করিয়া “ডাক” বলিতে থাকে ; আর তাহারা একযোগে প্রত্যেক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে “হেইয়া” হেইয়া” বলিতে বলিতে বল প্রয়োগ করে। যথা ;—

“কাট্টনের ডাক।”

দলপতি—“ধর্‌রে ধর, বাবা সকল, ভাইয়া সকল,
ধর্‌রে ধর—জোর করিয়া সমান করিয়া”

দলপতি—“মারে মা !” দলের অপরেরা—“হেইয়া” ;
„ তোর পুতে ডাকে শুন্‌ছ না ? „ „
„ শুনিয়া পুত করিম্ কি ? „ „
„ ধীরে ধীরে চলেছি ! „ „
„ চল সুন্দরী হাতের তাড় (১), „ „
„ জাঙাল বাইয়া (২) বন্ধুয়া যায় ; „ „
„ বঁধুয়া দেখি লাজে মরি ! „ „

* * *

„ লাজপায় লি (৩) বাজারং (৪) ঘর, „ „

(১) গিয়াছে ; (২) ভাত চড়াইতে ; (৩) স্ত্রীর ; (৪) দুইটী ; (৫) বড় হরিণ ; (৬) চোখেরপাতা।

(১) হস্তাভরণ বিশেষ ; (২) রাস্তা বাহিয়া ; (৩) লজ্জাবতী ; (৪) বাজারে

দলপতি		দলের অপরেরা	হেইয়া
”	একদিন গম থা'ই (১) দু'দিন জর ;	”	”
”	চল সুন্দরী করি মন,	”	”
”	আমরা খাইতাম সাউধের (২) ধন ;	”	”
”	আল্লার বরে নবির বরে,	”	”
”	সাতালি পর্ব্বত ডাকুৎ লড়ে।	”	”
”	ডাক শুনাইতে আন্‌লাম্ গাভুর,	”	”
	* * *		
”	আন্‌লাম্ গাভুর বাছি বাছি,	”	”
”	ছিঁড়ি ফেলিদে লোহার কাছি (৩)।	”	”
”	লোহার কাছি ন ধরে টান,	”	”
”	আলগুর কাছি (৪) পাকাইয়া আন।	”	”
”	জোরের জঙ্গী (৫)	”	”
”	মাথায় ভঙ্গী (৬) ;	”	”
”	ভঙ্গীর লাজে,	”	”
”	ঘুম না আইসে ফাটঝা বাসে (৭)।	”	”
”	বীর হনুমান !	”	”
”	হনুর বেটা (৮) ভানুর নাম।	”	”
”	থারু (৯)গড়াইদে (১০)নাইয়র (১১)যাম্	”	”
”	থারু বেচি (১২) লাড়ু খাম্,	”	”
”	লাড়ু লইয়া সহরৎ (১৩) যাম্।	”	”
”	জোরের কাম ;	”	”
”	পড়ের (১৪) ঘাম ;	”	”
”	ঘামের ঘুম ;	”	”
”	সুন্দরীর মুখে কে দিল চুম ?	”	”
”	রস্যার মুখে কে দিল চুম ?	”	”

(১) সুস্থ থাকিয়া ; (২) সদাগরীর , (৩) রজ্জু ; (৪) মোটা দড়ী ; (৫) সিপাহী ; (৬) পাগড়ী। (৭) দুর্গন্ধে। (৮) বেটা অর্থ পুত্র ; কিন্তু ইহাতে ভানুকে হনুর বেটা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত 'ডাক' রচয়িতাকে দোষী করা আমরা সমীচীন বোধ করি না। সম্ভবতঃ নিরক্ষর শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'ডাক' কথকেরা ভানুর বেটা হনুকে হনুর বেটা ভানু করিয়া ফেলিয়াছে। (৯) গহনা (১০) গড়িয়া দাও ; (১১) বেড়াইতে ; (১২) বিক্রয় করিয়া ; (১৩) সহরে ; (১৪) পড়িতেছে।

দলের　হেইয়া।

দলপতি		অপরেরা।	
"	হায়রে হায়!	"	"
"	হায় বোলায় !!	"	"
"	গা ঢুলাইয়া হায় বোলায় !!!	"	"
		"	ইত্যাদি।

[৪]

এ সকল ছড়ায় কৌতুক আছে, উদার আনন্দ আছে, অধিকন্তু ললিত শব্দ বিন্যাসে কতকগুলি থাপছাড়া ভাবও গ্রথিত আছে। ইহাতে ভাবুক বা বুদ্ধিমান পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন কি না, বলা যায় না। যাহা জলের মত গেলা যায়, বুদ্ধিমান সমাজে তাহার আদর কোথায়? বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝি না, বুঝিত বুঝাইতে পারি না,—এরূপ না হইলে কি আর ভাব বলা যায়? বস্তুতঃ ভাব হৃদয়ে অনুভব করিবার বিষয়; ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারিলে তাহার গৌরব কমিয়াই যায় বটে। তাই বলিতেছিলাম, ছড়া—বুদ্ধিমানের জন্য নহে, উহা নেহাৎ "ছেলে ভুলানো।" তবে যে "কাট্টলের ডাক"কেও ছড়ার কৌটায় রাখিয়াছি, সে কেবল কবিত্বের অভাবে! আর যখন বালক-বালিকাদের মস্তিষ্ক পরিচালনার ক্ষমতা জন্মে, খেলা ও কৌতুকের ভিতর দিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ করিতে এক প্রকারের কবিতা আছে,সে গুলিকে আমরা 'হেঁয়ালী' বলি। চাক্‌মাদিগের প্রচলিত সংজ্ঞা "বা-না।" এই হেঁয়ালী বা "বা-না"তে শব্দ লালিত্য এবং সরল আনন্দোচ্ছ্বাসও আছে, অথচ বুদ্ধির জটিলতা ও ভাবের বাঁধুনিও রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এ গুলি সংরক্ষণের প্রতি শিক্ষিতসমাজের আসক্তি এত সামান্য যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ নগণ্য হইলেও এই সমুদয় প্রাচীন টোট্‌কা টুট্‌কো উপেক্ষার জিনিস নহে। চট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক হেঁয়ালী ইহাদিগের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি বাছিয়া ফেলিলেও মূল চাক্‌মা'বানা'র সংখ্যা কম নহে। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে এখানে চাক্‌মা-সমাজে প্রচলিত ৩০টি মাত্র "বানা" রক্ষা করা গেল। জাতীয় প্রত্যেক অঙ্গের পরিচয় প্রদানই আমার বিশেষ লক্ষ্য।—

'হেঁয়ালী' চাক্‌মা সংজ্ঞায় 'বানা'।

"উয়রে মালা তলে মালা,
থগ্‌দি থগ্‌দি হাঁদে ভালা।" ১

১। উপরেও মালা, নীচেও মালা অর্থাৎ দুইদিকেই শক্ত খোলা; থাকিয়া থাকিয়া

"ফেল্যুং কাল্যা জীরা,
উদিল ছদরক্‌-পা,

উত্তর—কচ্ছপ।
হাঁটিতে বেশ—ভাল দেখায়।

ফুদিল মালতি ফুল,
ধরল্য করঙা”। ২।
“গাংকুলে কুলে বড়ই গাছ,
লড়ে চড়ে ন পড়ে।” ৩।
“দশ ভাইয়ে লড়াই ধরে,
দুই ভাইয়ে মারে”। ৪।
“পাঁচ ভাইয়ে তুলে,
বত্রিশ ভাইয়ে ভিড়ে;
এক ভাইয়ে ঠেলা মার্‌লে,
দৈর্য্যামুরৎ পড়ে”। ৫।
“বাবু সান্যা বজে;
চলা সান্যা বাজে;
বাঘ সান্যা লাফ মারে;
পাত্র সান্যা ডুবে”। ৬।
“ইঁজর-মাদাৎ খের-কুর
মেলি চেলে চাম্পাফুল”। ৭।
“আগজে ঝিলিমিলি
পাতালে লেজ;
কন্ খদায় বানাই দিয়ে,
কালিকল্‌জ্যায় কেজ্”। ৮।
“কাজালক্কে ভেক্কভেক্যা,
পাগিলে সিন্দুর;
যে ভাঙিং ন পারে,
তে গুত্তি সুদ্দা উন্দুর”। ৯।
“মাথাৎ খড়্গা, টিকিনিৎ চুল;
দশ ঠেং আগে—
তিন লেঙুর”। ১০।
“একুলে ধুম্‌ধাম
ওকুলে বিয়া;
ভাঙা নারিকুল জোড়া দিয়া”। ১১
“আট হাত ষোল আঁচু,
মাচমারা ঝিয়ে সাধু;
চুঙুনা খালৎ ফেল্যাং জাল,

২। কৃষ্ণজীরা ফেলিলাম, গাঁদা ফুলের গাছ উঠিল, মালতীফুল ফুটিল, কামরাঙা ধরিল।
উত্তর—তিল।
৩। নদীর তীরে তীরে কূল গাছ, নড়েচড়ে পড়ে না।
উত্তর—পক্ষ্ম অর্থাৎ চক্ষুলোম।
৪। দশভাইয়ে দৌড়াইয়া ধরে, দুই ভাইতে মিলিয়া মারে।
উত্তর—উকুন অন্বেষণ ও মারা।
৫। পাঁচভাই তুলিয়া ধরে, বত্রিশ ভাই মিলিয়া কবে; অন্য এক ভাই ঠেলা মারিলে সমুদ্রগর্ভে পড়ে।
উত্তর—ভাত খাওয়া।
৬। বাবুর মত বসে; কাঠবিড়ালের ন্যায় ডাকে; বাঘের মত লাফ দেয়; পাত্র অর্থাৎ আধারের ন্যায় ডুবে।
উত্তর—ভেক্।
৭। “ইঁজরের” মাথায় খড়ের গাদা খুলিয়া দেখিলে চাঁপা ফুল।
উত্তর—কাঁঠাল।
৮। আকাশে ঝিল্‌মিল করে, পাতালে লেজ; কোন ঈশ্বরে হৃদ্‌পিণ্ডে কেশ করিয়া দিয়াছে।
উত্তর—আম।
৯। কাঁচা সময়ে নরম, পাকিলে সিন্দুর; যে ইহা কি বলিতে না পারে, তাহারা সগোষ্ঠি ইঁদুর।
উত্তর—মেটে পাতিল।
১০। মাথায় খড়্গ, টিকিতে চুল; দশ পা এবং তিন খানি লেজ আছে।
উত্তর—চিংড়িমাছ।
১১। ভাঙা নারিকেল জোড়া দিয়া—এই কূলে ধুম ধাম ঐকূলে বিবাহ।
উত্তর—বন্দুক।

মাচ মারত্তে পরাণ যায়"। ১২।
"হেদ নয় ঘোয়াও নয়,
ফিরে পাকে পাকে ;
সুন্দর পুরুষ নয়,
থাগে ত্রি-লগে।" ১৩।
"লোহারে লোহা,
লোহারে ধর্‌লা ঘুণে ;
স্বর্গপুরে আগুন লাগ্যে
মারি দিব কনে ?" ১৪।
"হলদ্যা ফুল, চন্দনর মালা ;
ধরিৎ নপারে, বেতাগী কাঁদা" ।১৫।
"হিলৎ বিলৎ পানি নেই
গাজর আগাৎ কূয়া"। ১৬।
"এক হাত গাচ্ছোয়া,
ফুল ফুদে পাঁচ্চোয়া"। ১৭।
"এক পাতায় বুড়া হয়।" ১৮।
"বড় কল্‌গৎ সুতা ফুদে"। ১৯।
"খায়দে গুলার বচু নেই"। ২০।
"দুই ভাইয়ে লড়ালড়ি।" ২১।
"আগা কাবিলে গর‌্যা মরে।" ২২।
"তগায়, পেলে ন আনে"। ২৩।
"পরাণ নেই, মানুষ গিলে।" ২৪।
"চাল আগে ; তলা নেই ;
পঁঝা থবার জাগা নেই"। ২৫।
"চালর উয়র শ্বিয়াল ছা,
কিজাক্ কিজাক্ করে রা"। ২৬।

১২। আট হাত, ষোল হাঁটু সাধু মাছ মরত্তেগিয়াছে ; শুক্‌না খালে জাল ফেলিলাম, মাছ মারিতে প্রাণ বাহিরায়।

উত্তর—মাকড়্‌সা।

১৩। হাতীও নয়, ঘোড়াও নয়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে ; সুন্দর পুরুষও নহে, অথচ স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে।

উত্তর—চরকা।

১৪। লৌহরে লৌহ, লৌহকে ঘুণে ধরিল স্বর্গপুরীতে আগুন লাগিয়াছে, কে নিভাইয়া দিবে ?

উত্তর—রৌদ্র।

১৫। হল্‌দে ফুল, চন্দনের মালা ; বেতস কাটা প্রযুক্ত ধরিতে পারা যায় না।

উত্তর—মৌচাক।

১৬। খাল বিল (কোথায়ও) জল নাই, গাছের আগায় কূয়া।

উত্তর—নারিকেল।

১৭। এক হাত লম্বা গাছ, পাঁচটী ফুল ফুটে।

উত্তর—হস্ত।

১৮। এক পাতাতেই (গাছ) বুড়া হইয়া থাকে।

উত্তর—ওল।

১৯। বৃহৎ পর্ব্বতগাত্রে সূতা ফুটে।

উত্তর—তারা।

২০। এমন কোন ভক্ষ্যফল, যার বোঁটা নাই।

উত্তর—ডিম।

২১। দুই ভাই মিলিয়া বুঝাবুঝি করে।

উত্তর—মানুষের দাঁত।

২২। অগ্রভাগ কাটিলে বা বাঁধিয়া রাখিলে গোঁড়াও মরিয়া য'য়।

উত্তর—খাল।

২৩। তালাস করে, পাইলে আনেনা।

উত্তর—পথ।

২৪। প্রাণ নাই, (অথচ) মানুষ গ্রাস করে।

উত্তর—কোর্ত্তা।

২৫। চাল আছে, তলা নাই বোঝা রাখিবার জায়গাও নাই।

উত্তর—ছাত্তি।

২৬। চালের উপর শৃগাল শাবক, কিরকম কিরকম শব্দ করে।

উত্তর—মেঘগর্জ্জন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

[১] ক্রীড়া,—[২] কৌতুক (—নাচ, বাজীপোড়ান প্রভৃতি)
[৩] বাদ্য ও [৪] সঙ্গীত।

[১]

ক্রীড়া।

আধুনিক সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ক্রীড়াগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে কেবল যে বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া যাইতেছে এমন নহে, তদ্দ্বারা জাতীয় বলবীর্য্যও যথেষ্টরূপে রক্ষা পাইতেছে না। কারণ, প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে গতি পরিচালিত করিতে পারিলে যেমন সফলকাম হওয়া যায়, প্রতিকূলাচরণে তেমতি অনিষ্টের সম্ভাবনা! শীতপ্রধান দেশোচিত ক্রীড়াসেবায় আমাদের উপকারের আশা যত, অপকারভীতি ততোধিক। আর দেশীয় ক্রীড়াগুলিতে কাণাকড়িটীও খরচ নাই, অথচ প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা চলে; কিন্তু সভ্যতার চাকচিক্য নাই বলিয়া তৎসমুদায় অধুনা অবজ্ঞাত হইতেছে! "চট্টগ্রামাদি সভ্যতাবিরল দেশে" অদ্যাপি পল্লীগ্রামের নিভৃত অন্তরালে সেই সব প্রাচীন ক্রীড়া রাজত্ব করিতেছে দেখিয়া, দূর হইতে সেই 'সভ্যতা'কে নমস্কার করিতে ইচ্ছা যায়! কিন্তু সমাজ কি আর আমাদের নিষেধে কর্ণপাত করিবে? অনুচীকির্ষু যে আমরা, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য কোথায়? জানিনা, ভগবান্ এই হতভাগ্যদিগের প্রতি কবে কৃপাকটাক্ষ পাত করিবেন!

পুরাতনের আদর।

যাহাহউক এই পার্ব্বতীয়দিগের মধ্যে প্রাচীন ক্রীড়াগুলির যথেষ্ট সম্মান আছে। রাঙামাটিবাসী ছাত্রগণ ব্যতিরেকে কেহই তথাকথিত 'সভ্য খেলা'গুলির আশ্রয় পায় না। সুতরাং অনন্যোপায়েই হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। চাক্‌মাদের ক্রীড়াগুলির মধ্যে কয়টি আমাদিগের অনুকৃত, কোনটিবা সামান্য রূপান্তরিত এবং কোন কোন "থারা" আবার এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ক্রীড়াগুলিকে মোটামুটি তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শিশুক্রীড়া,—ইহাতে মন ও শরীরের বিশেষ কোন চালনা থাকে না, কেবল অনাবিল আনন্দ

মাত্র লাভ হয়। বলাধানের সহিত স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত বালক এবং কিশোরগণ দ্বিতীয় প্রকারের ক্রীড়াগুলি গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এইগুলি কিছু শক্তি-সাপেক্ষ। পূর্ব্বকালে এসকল "থারা"র যুবক এবং প্রৌঢ়ের দলও যোগদান করিত; এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তাহার বিশেষ কারণ,—সেকালে জীবনযাত্রা এত দুর্ব্বহ ছিল না; কঠোর সাংসারিক চিন্তায় এক্ষণে তাহাদের সে সুখ উৎসন্ন গিয়াছে। ৮।৯ বৎসরের শিশুসন্তানগুলিতে পর্য্যন্ত আর সেরূপ বালসুলভ মাধুরিমা খেলিতে দেখা যায় না, যেন সকলেই "অন্নচিন্তাচমৎকারা"! দারুণ ভবিষ্যৎভয়ে কাতর ও সন্ত্রস্ত! তৃতীয় শ্রেণীতে যে সমুদয় ক্রীড়াকে ভুক্ত করা যায়, তাহাতে বুদ্ধি-বৃত্তিই মার্জ্জিত হইয়া থাকে; শরীরের কোন ব্যায়াম হয় না।

শিশুক্রীড়া বহু বিধ, তন্মধ্যে কেবল দুইটীমাত্র এস্থলে উল্লেখিত হইতেছে। যথা:—

(ক) "ইজিবিজি থারা"য় কতিপয় শিশু মণ্ডলাকারে বসে এবং তাহাদের হাতগুলি সম্মুখে বিন্যস্ত করে। দলের সেয়ানা শিশু—

"ইজি—বিজি—কার্‌মা—বিজি—
মইচ্—চরে—ঘোড়া চরে—
সাধু—বইরে—কচু—রান—
বার্গি—উত্তান—মনোরাম—
এর্গা—দের্গা—রাজা—বাবু—
কৈরেদে—শুধা—হাত্তান—নেজা"—

বলিতে বলিতে প্রত্যেক শব্দের সহিত যথাক্রমে এক এক জনের হাত স্পর্শ করিতে থাকে। এইরূপে চক্রাকারে হাত ঘুরাইয়া বিন্যস্ত হস্ত সমুদয় স্পর্শ করিতে করিতে যে হাতে শেষোক্ত "নেজা" শব্দটী উচ্চারিত হয়, সেই হাত তখনই উঠাইয়া লওয়া হয়। অনন্তর পুনরায় এবংবিধ প্রক্রিয়ায় আবৃত্তি চলিতে থাকে। সর্ব্বশেষে যাহার হাতখানি অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই পরাজিত সাব্যস্ত করা হয়।

(খ) "কভাজাং থারা"র দুই বা ততোধিক শিশু পরস্পরের হস্তপৃষ্ঠ-চর্ম্মাকর্ষণে ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতে করিতে—

"কভাজাং—কভাজাং
মইনর—উয়র, বা—বাং
এক্যোরা বদা খোলা গন্নি থাং"

বলিয়া হঠাৎ প্রত্যেকে স্ব স্ব হস্ত সবলে আকর্ষণ করতঃ করতালুতে আপনাপন

মুখ নির্গত শব্দে বাধা দিতে দিতে "আবা" "আবা" করিতে থাকে। ইহাতে কোন জয়পরাজয়ের প্রতিযোগিতা নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রীড়া সমূহকে আবার দ্বিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। তাহার প্রথম পর্য্যায়ে কেবল সরল অপোগণ্ড বালকগণ মাত্র থাকে; দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাহাদিগ হইতে বয়োবৃদ্ধ দল অর্থাৎ কিশোর-যুবকগণই অধিকাংশরূপে যোগদান করে। বালকের খেলা যেমন :—

(ক) "পলাপলি খারা"—ইহা লুকোচুরি ক্রীড়ারই নামান্তর মাত্র। বালকগণ সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বেচ্ছানুরূপ সুবিধায় লুকাইয়া থাকে। অপর দলপতি জিজ্ঞাসা করে,—"তোমরা সকলে পলাইয়াছ; এখন আমরা খুঁজিতে পারি?" ইহাতে কোনও উত্তর পাওয়া না গেলে, বুঝিতে হইবে—"মৌনং সম্মতি লক্ষণং"। তখন তাহারা সোৎসাহে বিরুদ্ধদলকে খুঁজিতে আরম্ভ করে। যদি কাহাকেও তালাস করিয়া না পাওয়া যায়, ধৃত সকলে অন্বেষণকারিদলকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিলে 'কি হারাইবে' স্বীকার করাইয়া তবে বলিয়া দেয়। পক্ষান্তরে তাহারা এক "পির" হারিয়া যায়।

(খ) "পুৎপুৎ খারা"। ইহা জলক্রীড়া বিশেষ। আনাভি জলে সকলে দাঁড়াইয়া, তাহাদের মধ্যে একজনে সকলেরই সম্মুখে কোন ভাসমান বস্তু খণ্ড ডুবাইয়া আচম্বিতে ছাড়িয়া দেয়। আর সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সকলে জল-পৃষ্ঠোপরি ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে। ইতিমধ্যে যে ঐ ভাসমান বস্তু হস্তগত করিয়া মস্তকটী জলে ডুবাইতে পারে, সেই জয়ী হয়! কিন্তু সে ডুব দিবার পূর্ব্বে যদি অপরেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের লক্ষ্য পদার্থ উহার হস্তগত হইয়াছে, তখন তাহারা শারীরিক বলের প্রতিযোগিতা দেখায়। যাহার সামর্থ্য অধিক, সে অপর সকল হইতে বস্তুটি বলে গ্রহণপূর্ব্বক মস্তক জলে ডুবাইয়া জয়লাভ করে।

(গ) "বুদ্ধিমান্ খারা"। ইহাতে একজনকে রাজা করিয়া অপরেরা দুই ভাগ হইয়া যায়। রাজা মধ্যস্থলে এবং তাহারা দূরে দূরে থাকে। পরে একদল হইতে একটী বালক আসিয়া রাজার নিকট অতি গোপনে অপরদলের কোন বালকের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া যায়। ইহাতে বিরুদ্ধদলের সকলে বিবেচনা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রাজার কাছে পাঠায়। তাহাতে যদি সেই নামোল্লিখিত বালকই আসে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে 'ধৃত' ঠিক করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেয়; অন্যথা সে বালক প্রতিযোগী দলের কাহারও নাম বলিয়া যায়, তখন সেই দল হইতে বালক আসে। এইরূপে কোন দলের সকলেই ধরিয়া গেলে "এক পির" পরাস্ত হয়।

(ঘ) "ঘর চাক বাহির চাক খারা"। সমতল ভূমিতে একটি সুবৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া সমবিভক্ত বালকগণের একদল পরিধিমধ্যে এবং অপর দল বাহিরে থাকে। অনন্তর "ঘর চাক্ না বা'র চাক," "বা'র ছাক্ না ঘর চাক্" বলিতে বলিতে 'ঘরের' দল 'বাহিরের' দলকে এবং 'বাহিরের' দল 'ঘরের' দলকে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগে টানিয়া আনিয়া স্ব স্ব দলপুষ্টির চেষ্টা করে। যদি কোন দলের সকলকেই সীমাতিক্রম করাইতে পারা যায়, তখন অপর দলের বালকেরা সানন্দে বলিয়া উঠে,—"এক পির"।

(ঙ) "পত্তি খারা"। ইহাতেও সুবৃহৎ বৃত্তের ভিতরে এবং বাহিরে বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। পরে 'ডু ডু খেলা'র ন্যায় দুই পক্ষ হইতে পর্য্যায়ক্রমে এক একজন "পত্তি ....." রবে নিশ্বাস লইয়া সীমার বহির্ভূত অপর দলকে আহ্বান করিয়া আসে। যদি বিপক্ষীয়েরা আহ্বানকারীকে আবদ্ধ করিতে পারে, কিম্বা তাহার নিশ্বাস ফুরাইয়া গেলে মাত্র ছুঁইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবে সে মরিয়া যায়। অপর দলে এইরূপে কেহ যখন 'মরে', তখন তাহার বিপক্ষদলের 'মৃত' ব্যক্তি 'বাঁচিয়া' খেলার অধিকার পায়। এইরূপে কোন দলের সকলে 'মরিয়া' গেলে 'এক পির' আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে।

শেষোক্ত ক্রীড়াদ্বয়ে শারীরিক বলের প্রয়োজনীয়তাই অধিক। সুতরাং এই দুই খেলায় অধিকতর বলবান্ বালকের আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট বালকদিগের উপযোগী "ঘিলাথারা", "নাদেং (লাটিম) খারা", "মাছখারা", "পোক্‌খারা", "কুমীর খারা", "শামুক খারা" প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের অনেক ক্রীড়া আছে। শারীরিক ব্যায়ামপ্রধান আর দুইটী খেলা আছে, তাহাতে বালক—কিশোর—যুবক ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করিয়া থাকে। সেই দুইটী যথা :—

(ক) "গুদু খারা"। ইহা 'ডুডু খেলা'রই নামান্তর মাত্র। সুতরাং তাহার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কথা এই, উভয় দলের মধ্যে যাহাতে সীমা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার আখ্যা—"গাং" অর্থাৎ নদী। সুতরাং অপর পারে যাইতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে পায়ের শক্তি বুঝিতে হয়।

(খ) "পোর খারা"। ইহা চট্টগ্রামে 'পড়খেলা' নামে প্রথিত। যাবতীয় শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে এই ব্যয়সাধ্য ক্রীড়াই যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শারীরিক ক্রীড়ার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাতে তাহা অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে সমান ও নিয়মিতরূপে

রক্ত সঞ্চালিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আধুনিক সমাজে ইহার আদর ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এই খেলার নিয়ম যথা :—

ক্রীড়কগণ দুই সমানভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেকবারে একদল পলাইতে চায়, অপর দল বাধা দান করে। বাধাদানকারীদের পক্ষে একজনের উপর প্রাধান্য অর্পিত হয়, তাহার উপাধি—"মোইল্লা"। তাহার দলের প্রত্যেকের জন্য সমতল ভূমিতে এক একটী সমান্তরাল স্থূলরেখা ক্রীড়াভূমিতে অঙ্কিত থাকে। তাহারা স্ব স্ব রেখায় দাঁড়াইয়া অপর দলের যাহাকে পাওয়া যায়—বাধা দিতে প্রস্তুত হইলে 'মোইল্লা' বিপক্ষদলকে আহ্বান করে—'পোর' অর্থাৎ পড়। তাহাদিগকে 'পড়িতে' বা পলাইতে এই রেখাগুলিতে অবস্থিত বাধাদাতা ও 'মোইল্লার' হাত হইতে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যদি কেহ পলাইবার সময় তাহার বাধাদাতা তাহাকে কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে, অথবা 'মোইল্লা' রেখাগুলির দুই পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া পরিভ্রমণকালে যদি বিরুদ্ধদলের কাহাকেও কোন প্রকারে স্পর্শ করে,তবে পলায়নকারিদল পরাজিত হয়। অন্যথা কোনরূপে এই সমুদয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দলের একজনও যদি এই রেখাগুলি পার হইতে এবং পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তবে তাহাদেরই জয় হয়। ফিরে বার খেলিতে পরাজিত দলের উপরই বাধাদান করিবার ভার পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর—তাস, পাশা, "প্যেক্ (পাখী) খারা" (১) প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালক ক্রীড়ারও অভাব নাই বটে, কিন্তু অতিশয় অল্প। এই সকল দ্বারা মস্তিষ্কচালনা ব্যতীত অপর কোনও উপকার হয় না। সুতরাং শরীররক্ষাকার্য্যে এই গুলিতে উপকার হইতে অপকার অধিকতর। দুরূহ সংসারকষ্ট-বিমোচনের নিমিত্ত আমাদিগের যেরূপ অহর্নিশ খাটিবার প্রয়োজন আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, এই শ্রেণীর ক্রীড়াসকল যে উন্নতির একান্ত পরিপন্থী—তাহা অচিরে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দস্যুতার রূপান্তর—সভ্য কি অসভ্যের উপযুক্ত কার্য্য বলিতে চাহি না, কোন প্রকারের "জুয়াখেলা" ইহাদের মধ্যে এযাবৎ প্রবেশ করে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অভাবক্লিষ্ট হইলেও ইহারা স্বীয় অবস্থায় অনেকটা সন্তুষ্ট থাকিতে জানে। সুতরাং তাদৃশী দুর্নীতি অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জন ইহাদের নিকট অদ্যাপি ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হয়।

---

* "প্যেকখারা" আমাদের সমাজে 'বাঘবন্দী' খেলা নামে পরিচিত। ইহা কতকপরিমাণে 'দাবা খেলা'রই অনুরূপ। 'ছক' বা ঘরে একজন বাঘ এবং অন্যজন পাখী পরিচালিত করে

কিন্তু যাদুকরদিগের "তুমুরী খারা" ইহাদিগের মধ্যেও বেশ পশারলাভ করিয়াছে। মন্ত্রবলের অদ্ভুত রহস্যসমূহ উৎসব-আমোদে বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়। তজ্জন্য তাহার উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকে।

[২]

কৌতুক।

কৌতুক নানাবিধ। মনুষ্যজীবনও কৌতুকময়! বাক্যে যেরূপ যতি, কর্ম্মজীবনেও তেমনি মধ্যে মধ্যে কৌতুকের প্রয়োজন। ইহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, কার্য্যেও নিত্য নূতন বল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা যথাসম্ভব নির্দ্দোষ হওয়া উচিত। কৌতুকলীলা একান্নবর্ত্তী পরিবারেই যেন সমধিক। পরস্পর পরস্পরে হাসিয়া খেলিয়া থাকিতে অবশ্য সকলেই ইচ্ছা করে। আর কেবল দাম্পত্য অর্থাৎ পৃথগীভূত পরিবারে যে কৌতুক, তাহা নিতান্তই এক ঘেঁয়ে। তাই একান্নবর্ত্তিতার অভাবে চাকমাসমাজে কৌতুকের অবসর বড়ই দুর্ল্লভ; সাময়িক পর্ব্ব বা উৎসব বিশেষে মাত্র যাহা কিছু সামান্য প্রচলিত আছে। অথচ বিলাত প্রভৃতি দেশে একাগ্রবর্ত্তিতা বিরল হইলেও ইহার প্রাধান্য বিস্তর। তাহার কারণ, সেসব দেশে সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা বিদ্যমান এবং দেশও তদুপযোগী অর্থশালী। আমাদের ন্যায় 'অন্ন-চিন্তা-বিষধর-দংশন-কাতর' পরিবারে কত আর কৌতুকের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে?

মদ্যোৎসব।

মদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তর বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, অতিরিক্ত সুরাক্ষয় ইহাদিগের উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। যাবতীয় অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাহ্ণেই ইহাদিগকে সুরার আয়োজন করিতে হয়। রাজা বা হেড্‌ম্যানগণের ক্রিয়াকর্ম্মাদিতেও প্রজাসাধারণের যথানিয়মে মদ্য উপঢৌকন দিবার প্রথা আছে, অন্যথা তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মকার্য্যমাত্রেই সুরাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি যে, সুরাব্যতিরেকে ইহাদের 'তত্ত্ব' দেওয়াও চলে না। বিশেষতঃ বিবাহের প্রস্তাবনা উপস্থিতকালে উহার একান্ত প্রয়োজন। উৎসবাদিতে অহর্নিশ সুরাসত্র খোলা থাকে; যাহার যত ইচ্ছা পান করুক,—কোনও বাধা পাইবে না! আর তৎপরিণামে যখন সমবাৎ বীভৎস রহস্যসমূহ প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে পল্লিবাসের সকলে ও সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা সশেষ আনন্দ অনুভব করিতে থাকে।

অপরাপর জাতিতে যেমন নৃত্যাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদের রীতি আছে,

ইহাদিগের তেমন কিছুই নাই। বস্তুতঃ সুসভ্য জাতিসমূহের পক্ষে ইহা একটি কলঙ্কবিশেষ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির এহেন নিকৃষ্ট আয়োজন—কেবল পবিত্রতার বিরোধী নহে, শিষ্টাচারের পক্ষেও নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হয়! কতকগুলি নীচশ্রেণীর ভাড়াটে মেয়ে বা নির্দ্দিষ্ট কয়েক রাত্রির নিমিত্ত ধারকরা নর্ত্তকী অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে, আর পিতা, পুত্র, গুরু, শিষ্য প্রভৃতি সকলে মিলিয়া হা করিয়া তাহাদের প্রতি তাকাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে 'বাহবা বাহবা' ধ্বনিতে পাপস্ফূর্ত্তি জ্ঞাপন করে! কি বীভৎস দৃশ্য! যাহারা ইচ্ছা করিয়া এরূপে মনকে কলুষিত করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির কখনও প্রশংসা করা যায় না। চাক্ষুষাদিগের যাহা কিছু নৃত্য "মহামুনি" মেলায় দেখাইয়া আসিয়াছি; সেই অবিবাহিত যুবকযুবতীদিগের উদ্‌ভ্রান্ত নৃত্য দেখিলেও লজ্জায় চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসে। পরস্পরে বাহুলতা বেষ্টনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন প্রকারে যে নর্ত্তনলীলা প্রকটিত করে, তাদৃশ কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য আর চিত্রিত করিতে চাহি না।

নাচ।

ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বাজী পোড়াইবার ব্যবস্থাটি মন্দ নহে। ইহা একদিকে যেমন বিশুদ্ধ, পক্ষান্তরে তেমনি শিল্পকলা-প্রদর্শক! আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতজীবনে কামানের নাম শুনিলেই ভয় পাই; বোমের আওয়াজটা মাত্র অতি কষ্টে সহিয়া লইতে পারি! এতদ্ভিন্ন আগ্নেয় যন্ত্র যাহা কিছু সমস্তই আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। কেহ কেহ বা বাজীতে কতকগুলি টাকা ভস্মসাৎ করিয়া নিরর্থক অপব্যয়ে স্বীকৃত নহেন। তাঁহাদের এইরূপ সদ্‌যুক্তিতে অবশ্য আমাদেরও সহানুভূতি রহিয়াছে; কিন্তু সেই ব্যয়িত টাকাগুলি বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় না, তৎসমুদয় অনেকেরই জীবনযাত্রার সাহায্য করে। তবে বাজীর খরচটা অপর কোন সৎকর্ম্মে ব্যয় করাই শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা। সাধারণ বিবাহাদিতে চাক্‌মাগণ বাজীর জন্য ব্যয় তত উপযোগী মনে করে না; কিন্তু অন্ত্যেষ্টিকালে ইহার বিরাট আয়োজন হইয়া থাকে। যতদূর অনুমিত হয়, ঈদৃশী প্রথা মঘদিগের সাহচর্য্যেই সংক্রামিত হইয়া থাকিবে।

বাজীপোড়ান।

[৩]

সুবিধা পাইলে ইহারা বিবাহ এবং অপরাপর উৎসবসমূহে অধুনা বিদেশীয় বাদকদল আনয়ন করে, স্বকীয় বাদ্য যন্ত্রাদির ব্যবহারে তাহাদিগকে প্রায়ই উদাসীন দেখা যায়। জুমমঞ্চে বা যুবকসম্প্রদায়ের লীলানিকেতনে মাত্র বাঁশী, মুরলী, শিঙা, "জাম্‌মুয়া"

বাদ্য।

এবং "ধুদুগ" প্রভৃতি যন্ত্র প্রচলিত। এসকল ব্যতীত বেহেলা, সানাই, সারঙ্গ প্রভৃতিরও আমদানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সাধারণ উৎসবাদিতেও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গস্বরূপ এ সমুদয়ের 'সঙ্গত' চলিত; এক্ষণে তাহা ক্বচিৎ মাত্র পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু যখন হয়, তৎসঙ্গে "ঢুল" (ঢোল), "খেংগরং" প্রভৃতিও থাকে। এস্থলে শিঙা, ধুদুক, জান্দুরা, খেংগরং ইত্যাদি যন্ত্রনিচয়ের পারিভাষিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইতেছে। প্রথমে তৎপরিচয় দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য-প্রক্রিয়াও বিবৃত করিতেছি :—

"শিঙা"—মহিষশৃঙ্গেরই প্রশস্ত। তদভাবে শূন্যগর্ভ পাতলা অথচ মোটা বাঁশের মুখে 'বিগুলের' ন্যায় অপর এক সরু বাঁশের মুখ লাগাইয়া লয়, তাহাতেই ধীরগম্ভীর ফুৎকার দিয়া বাজাইয়া থাকে। বন্য পশুপক্ষী তাড়াইতে জুমক্ষেত্রে ইহা প্রায়ই নিনাদিত হয়।

"ধুদুগ"—দুই প্রান্তে 'গিরে' থাকে, এমন বাঁশের পর্ব্বখণ্ড লইয়া মধ্যভাগ হইতে সামান্য একখানি বাখারি পরিত্যাগে প্রস্তুত হয়। ইহা উদর পার্শ্বে লাগাইয়া কাঠিদ্বারা বাদ্য করে। তখন সেইরূপ আর একটী ভূমিতে রাখিয়া দুই কাঠিতে ধুদুগের তাল রক্ষা করিয়া থাকে; তাহার আখ্যা হয় "দগর"।

"জান্দুরা"—বাঁশের ন্যায় উদ্ভিদবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত। দীর্ঘ প্রস্থ—প্রায় এক হাত করিয়া হইবে। কাঠিগুলি পাশাপাশি করে সাজান মাত্র। তাহার এক পৃষ্ঠে ধরিয়া অন্যপৃষ্ঠে করতলাঘাতে বাদ্য করে।

"খেংগরং"—লৌহনির্ম্মিত চক্রাকৃতি পদার্থ। একদিকে লৌহশলাকার প্রান্তদ্বয় বাহির হইয়া থাকে; মধ্যভাগে একটি 'জিহ্বা'ও দেওয়া হয়। কেহ কেহ বাখারিখণ্ড দিয়াও ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খেংগরং বাজাইবার সময় মিলিত প্রান্তদ্বয়ে একখানি সুতা বাঁধিয়া লয়। উক্ত জিহ্বায় মুখ লাগাইয়া থাকিয়া থাকিয়া সুতাখানি টানিতে টানিতে মৃদুলতানে নানা রাগ রাগিণীর ঝঙ্কার দেয়।

"ঢুল"—আমাদের দেশীয় ঢোলই এখানে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত নামে পরিচিত। অন্যান্য সময়ে ত আছেই, মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্নানাদির সময় এবং অন্ত্যেষ্টিকালেও ইহার বাদ্য একান্ত আবশ্যক। এজন্য প্রায় প্রতি গ্রামেই 'ঢুল' রক্ষিত হয়। তাহা না হইলে গ্রামান্তর হইতে হাওলাত লওয়াও চলে।

বংশী ও মুরলীর গঠনপ্রণালী প্রায় সমান। তারতম্য মাত্র এই, বাঁশীর এক প্রান্ত মুখের মধ্যে দিয়া বাজাইবার নিমিত্ত চেটানো আছে, মুরলীর তাহা

নাই। কেননা, মুরলী আড় করিয়া ফুৎকারমাত্র প্রয়োগে ধ্বনি তুলিতে হয়। ইহারা বাঁশী এবং মুরলী বাজাইতে সাতিশয় পটু। এতদুভয়ের সাহায্যে অধিকাংশ যুবক ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া থাকে।

[৪]

অধুনা ইহাদিগকে যাত্রা, কবির গান প্রভৃতিতে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করিতে দেখা যায়। সম্পন্ন পরিবার মাত্রেই উৎসবাদি উপলক্ষে এই সমুদয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সঙ্গীতকে যাহারা ভালবাসিতে জানে না, এ সংসারে তাহাদের জীবন সাতিশয় নীরস। ইহা যে কেবল 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' যায় তাহা নহে, হৃদয়কে এমন অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে উত্তেজিত করে, যাহাতে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। পাপকোলাহলপূর্ণ জগতের জটিলতা—কুটিলতা ও কামিনীকাঞ্চনের চিন্তা ছাড়িয়া প্রাণ যে উধাও ভাবে কোথায় সেই সচ্চিদানন্দে গিয়া (১) মগ্ন হয়, সঙ্গীতের সুললিত রাগরাগিণীপূর্ণ ঝঙ্কার ততদূর পৌঁছিতে না পারিলেও গায়ক কি শ্রোতা তাহার প্রতি আর লক্ষ্য করে না, অথবা ফিরিয়া দেখিবারও আবশ্যক মনে করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'প্রসাদী মাল্‌সী' পদলালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে, অথচ তাহা কর্ণ অপেক্ষা অন্তঃকরণকে অধিকতর পরিতৃপ্ত করে।

সঙ্গীত।

ইহাদিগের সঙ্গীত সমুদয়কে রসভেদে বিভক্ত করা দুঃসাধ্য, এমন কি অনেক স্থলে অসাধ্যই বটে। কেননা, প্রায় সঙ্গীতেই দুই বা ততোধিক রসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এস্থলে ভাবানুসারেই শ্রেণীভেদ করা হইল। ভাবচতুষ্টয়, যথা :—ভক্তি, উদাস, বিরহ এবং প্রেম। নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে—ক্রমপরবর্ত্তী অপেক্ষা ক্রমপূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের সমাদর অধিকতর; সুতরাং সমাজ অনুন্নত বলিয়া ক্রম-পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা ক্রমে পরবর্ত্তী ভাবের সঙ্গীতই ইহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্রচলিত।

ভাবচতুষ্টয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উৎসবামোদে ইহারা "গেন্‌কুলী" আনিয়া কথকতা শ্রবণ করে। বলিতে কি, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাতে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। রঙ-খেয়াল বা কাহিনীর ভিতর দিয়া গভীর ধর্ম্মভাব এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহযোগে সুনীতি-গর্ভ উপদেশ সমূহ যখন নানাবিধ সুর সংযোগে প্রকটিত হয়, তখন প্রত্যেকেরই মনোরঞ্জন

স্তোত্রগান।

(১) কিন্তু মহাকবি মিল্‌টন" Paradise lost" এর একস্থলে লিখিয়াছেন,—" Music charms the sense, eloquence the soul" কথাটা নিতান্তই একদেশ দর্শিতাসূচক বটে; তবে তাঁহার জীবনের যাবতীয় কবিতাগুলির আলোচনায় বুঝা যায় যে, পারিবারিক বিপ্লবে মস্তিষ্কের উপদ্রুত হইয়া তিনি এইরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হইবার কথা। বস্তুতঃ এতাদৃশ নির্ম্মল আমোদ সকল সম্প্রদায়েরই প্রাণের সামগ্রী। পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী যে আমাদপ্রমোদ একত্র মিলিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহা কেনই বা আদরের না হইবে? 'গেন্‌কুলি'গণ সচরাচর যে সকল 'পালা' গান করে, তন্মধ্যে "গোজেনের লামা" অর্থাৎ গোঁসাইর (পরমেশ্বরের) স্তোত্র সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়াকর্ষক! ইহার আগাগোড়া উদাসিভক্তের মরম কথায় পরিপূর্ণ। উহার রচয়িতা শিবচরণ সংসারাসক্তিবিরহিত ছিলেন। "কান্তীগোছা"য় তাঁহার জন্ম হয়।

উদাসী শিবচরণ।

বাল্যকাল হইতেই একমাত্র পুত্রের উদাসভাব দেখিয়া, তদীয় পিতামাতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছিলেন; তজ্জন্য বিবাহ করাইয়া তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই প্রলোভনে ফেলিতে পারা যায় নাই। অনন্তর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা হয়,—তথাপি তিনি আপন ইচ্ছায় চলিয়া যাইতেন। আহারের সময় মাতা পুত্রকে না পাইয়া তাঁহার নিমিত্ত "ভাতমোচা" (১) "ফুলবারেঙে"র মধ্যে রাখিয়া দিতেন। আশ্চর্য্যের কথা, ২।৩ মাস পরে শিবচরণ আসিলেও নাকি সেই ভাত গরম পাওয়া যাইত; এমন কি কোন কোন বারে সেই পর্য্যুসিত ভাত হইতে বাষ্পও উঠিত! অবশেষে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। তারপর তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৎকৃত "গোজেনের লামা" সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রায় সকলেই উহার প্রতি ভক্তিমান্। শুনা যায়, তাঁহার প্রণীত সাতটী 'লামা' আছে, কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধানেও ছয়টীর অধিক পাই নাই। যাহা পাইয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

গোজেনের লামা।

(প্রথম।)

উজানি ছরা লামনি ধার,
ন আছিল সৃষ্টি জলৎকার।
জল-উপরে গর্য্যে (২) স্থল,
বানেল (৩) গোজেনে জীব সকল।
আরেয়ে (৪) বানেয়ে যার জনম,
আগে ছালাম্ তুং (৫) তার চরণ।
চাঁনে সূর্য্যে স(হো)দর ভেই (৬),
ছালাম্তুং উদ্দিশে ভূমিৎ থেই (৭)।

(১) ভাতের পুটলী। (২) গড়িয়াছে; (৩) বানাইল (তৈয়ার করিল)। (৪) পূর্ব্বে; (৫) সালাম দিতেছি; (৬) ভাই; (৭) ভূমিতে রাখিয়া।

সমুখে ছালামন্তং পুগেদি (১)
পছিমে ছালামদ্যাং পিজেদি (২)।
উত্তরে ছালাম্ স্তং বাঙেদি,
দক্ষিণে ছালামদ্যাং দেনেদি (৩)।
মোরে বিধিয়ে দয়া হোক;
তিন দেব-চরণৎ ছালাম্ রোথ (৪)।
ন বুঝে তিন দেবে যেই সকল,
সেই সকল বড় কমল, ফুল কমল।
মা সরস্বতী ছালামৎ,
যোগাই দিত গাই গীতপদ।
ছালাম মানেই তপসী,
ধর্ম্মশীলা সন্ন্যাসী।
একা মনে ভজুঙর (৫);
ছালামৎ জানেলুম্ দেব কমল।
পূজার গুরু মানেলুং,
হাজার ছালামে জানেলুং।
মর্ত্ত্যে পড়ি জনম যার;
তার চরণে নমস্কার।
দশমাস দশদিন দুখ পিয়ে (৬);
জম্বু দিবৎ নি (৭) জন্মিয়ে।
পূরি চেলুং (৮) চোখ ভরি;
মা-বাপ পারা (৯) নেই দেশভরি।
পড়োয়া (১০) বুঝে আখরৎ (১১);
এজের (১২) মানেই লোক সংসারে।
মা-বাপ চরণে ভজিলেই (১৩);
সকল তিথ্য (১৪) ফল পাই ভেই।
জ্ঞানী ধ্যানী ছালাম স্তং;
পড়োয়া পণ্ডিত বুঝিলং।

---

(১) পূর্ব্বদিকে; (২) পেছন দিকে; (৩) ডান দিকে; (৪) থাকুক; (৫) ভজনা করিতেছি। (৬) পাইয়া; (৭) জম্বুদ্বীপে কি; (৮) চাহিলুম (দেখিলাম); (৯) অপেক্ষা; (১০) শিক্ষিত; (১১) অক্ষরে; (১২) আসিতেছে; (১৩) ভজনা করিলেই; (১৪) তীর্থ।

সবায় ছালাম মুই দিলুং ;
গীত সাধনান সাধিলুং।
গীত একলামা পূরেয়ে (১) ;
বুঝিল বুঝিব মানেয়ে (২)॥

(দ্বিতীয়।)

তঁদাৎ (৩) বেরেই ধোপ (৪) কাপড় ;
গোজেন-চরণৎ ভজঙর।
আগে ছালাম দেয় শিবচরণ,
মাগং (৫) গোজেনর তুন (৬) দুই চরণ।
ছেয়ার (৭) তলে রাখে-দ (৮),
একালে ওকালে তরে-দ (৯) ;
জন্মে জন্মে দেখা হক,
চিত্তে মনে একা হক।
দেবাংশি গোজেনে ন দোষি,
অবুঝা মানেরে ন বুঝি।
শুন শুনরে পড়োয়া ভেই ;
দ্বি-বা অক্ষরে তরি যেই।
গুরু সাধি না পেয়ে (১০) ;
অনা গুরুয়ে (১১) পার হয়ে ?
সাধি আনং (১২) আর জনম,
সকল দান করঙর(১৩) এই জনম।
জুরি-ন পাল্লে (১৪) কুয়ৎ পেব (১৫) ?
ভজিলে চরণে কূল পেব ?
ন-র'লে (১৬) ধন মান সাধনে,
তরিব মানেই লোক ফুল দানে।
গুরুচরণ সার করে ;
বংশ ধন কি পার করে ?
একামনে ভজিলে ;
সকল তীথ্য ফল পায় বেলে (১৭)

(১) পূর্ণ হইয়াছে ; (২) মনুষ্যে ; (৩) গলায় ; (৪) শুভ্র অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ; (৫) মাগিতেছি ; (৬) হইতে ; (৭) ছায়ায় ; (৮) রাখিত ; (৯) তরাইত। (১০) পাইয়া ; (১১) গুরুব্যতিরেকে ; (১২) আনি ; (১৩) করিতেছি ; (১৪) জুটা'তে না পারিলে ; (১৫) কোথায় পাইব ; (১৬) না থাকিলে ; (১৭) বলিয়া।

দয়া দে-লে (১) সার করে ;
সাধিলে দজগৎ (২) পার করে।
অপার পানি (৩) সাগরে ;
ত্রিশ তিন জাতি (৪) ভাজ (৫) পড়তুম্-
গই (৬) আগরে (৭)।
ভজে মানেই লোক এই কালে ;
যমে ন ধরিব ঐ কালে।
যে বর মাগে সে বর পায়,
গোজেনে বর দিলে ন ফুরায়।
গোজেন-মেইয়া (৮) উদ'নেই (৯) ;
বুঝি পারি কে ভাই সেই।
পরম বৃক্ষে ভর দিয়া ;
বুঝি পারে কে তোর মেইয়া ?
সকল জীবে বেদায় (১০) হোক ;
চিত্তে মনে একা হোক।
পরম গোজেন কিয়ৎ (১১) থায় (১২) ?
সাতবার সাধিলে সেই ন পায় !
তঁদা (১৩) সাধি আনিব ;
পরম গোজেনে ভুজিব।
চরণে ছালামে ভুঝিলে ;
ধর্ম্ম সাধনান পাই বেলে।
ছালাম দিবার কাছেল যে (১৪),
গীত দ্বি-লামা ফুরেল যে (১৫)।
দ্বি-লামা ছিরেলে (১৬) ন যেবং (১৭) ;
গোজেন-সম্মুখে বর লবং (১৮)।

(তৃতীয়।)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ে,
আরাধন করঙর হাত যোড়ে।

(১) দেখিলে ; (২) মুসলমানী শব্দ—নরক হইতে ; (৩) জল ; (৪) তেত্রিশ জাতি ; (৫) ভাষা ; (৬) পড়িতাম গিয়ে ; (৭) অক্ষরে ; (৮) ঈশ্বরের মায়া ; (৯) অন্তনাই ; (১০) দেখা ; (১১) কিসে ; (১২) থাকে ; (১৩) এস্থলে সুকণ্ঠ ; (১৪) কাছাইল অর্থাৎ ফুরাইয়া আসিল যে ; (১৫) ফুরাইল যে ; (১৬) শেষ হইলে ; (১৭) যাইব না (১৮) লইব ।

দুখ্যাকুলে যার জনম,
তঁদা সাধঙর পায় জনম।
হীন কুলে ন-যিদুং (১),
দুখ্যাকুলে ন-হদুং (২)।
হাদে (৩) ন-করতুম্ (৪) জীববধ,
যুগে যুগে ন পড়্‌তুম্ (৫) দজগৎ।
পরম বৃক্ষি মোর ন-হদ (৬)।
চিদা-চর্জ্জা (৭) ন-থেদ (৮)।
কথা ন-কদ (৯) তলেদি (১০),
লোকে ন-কত্ত (১১) কলঙ্কী।
রোগে বেদে (১২) ন ধত্ত (১৩),
অজল (১৪) নীজ দাৎ ন-হদ (১৫)।
পোড়া ন-পিদুং (১৬) ধানদি,
ঊনা (১৭) ন-হদুংগোই (১৮) জনেদি।
অবুঝ (১৯) জন্ম ন-হদুং,
তিতা কথা (২০) ন-শুন্দুং (২১)।
কানে ন-শুন্দুং কুকথা,
পরে ন-কথ কুকথা।
পড়োয়া পণ্ডিত যেই দেশে,
জন্ম হদুং-গৈ (২২) সেই দেশে।
আরনি (২৩) রাজার দেশ লাক্‌-ন-পাং (২৪);
অগাধে অপথে যে-ন-পাং (২৫)।
যেদক্ (২৬) চিদা থায় ন-জান্দুং (২৭),
যেদক্ পোড়াধোয়া (২৮) ন-পেদুং।
গীত তিন লামা ফুরেলুং (২৯),
সভায় হুজুর জানেলুং (৩০)।

---

(১) না যাইতাম (২) না হইতাম অর্থাৎ না জন্মিতাম ; (৩)হাতে ; (৪) না করিতাম ; (৫) পড়িতাম না ; (৬) না হইত, না হইতাম ; (৭) চিন্তাভাবনাদি ; (৮) না থাকিত ; (৯) না কহিত ; (১০) নীচ অর্থাৎ তোষামুদী(১১) না করিত ; (১২) ব্যাধিতে, (১৩) না ধারিত ; (১৪) উচ্চ ; (১৫)না হইত ; (১৬) পাইতাম (১৭) কম ; (১৮) না হইতাম গিয়ে ; (১৯) মূর্খ ; (২০) কর্কশবাক্য ; (২১) না শুনিতাম ; (২২) হইতাম গিয়ে ; (২৩)আরও (২৪]) দেখা না পাই ; (২৫) যাইতে না পারি ; (২৬) যত ; (২৭) না জানিতাম ; (২৮) লাঞ্ছনাদি ; (২৯) ফুরাইলাম ; (৩০) জানাইলাম।

(চতুর্থ।)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ন,
ভজিলুং গোজেন-চরণান।
গীতে রঙে উল্লাসে
সাধঙর (১) সাধনান (২) খোলাসে (৩)।
দুখ্যা জন্ম ন-হুদুং,
সুখ্যা জন্ম হুদুং-গোই,
বাবে (৪) এ-দ (৫) গম্ (৬) দিনে,
জন্ম দিত সুক্ষেণে (৭);
সাদি (৮) ঘরৎ উবশ্ তুম্ (৯),
মন খোলাসে খেলেদুং (১০);
জাতে কুলে হুদুং গোই,
থানে ঠমগে (১১) হুদুংগোই।
ধর্ম্মী মা-বাপ লাগ-পিদুং (১২),
চিদ-সুখে মন-সুখে দুধ খেদুং (১৩);
সাত ভেই সাত ভোন (১৪) লাগ-পিদুং,
ননেয়া (১৫) খুলা বো'য়া (১৬) মুই হুদুং;
সোনা-ধুলনৎ ধুলে দাক্ (১৭),
দ্য'র (১৮) ভঙানি (১৯) ভঙেদাক্;
জেত্তা (২০) সমারে জেদেঙা (২১);
খুত্তা (২২) সমারে খুড়াঙা (২৩);
কালী কুশ্যারী বের বাড়ক্ (২৪),
গুত্তিগুদরি (২৫) ডেল (২৬) বাড়ক্।
ধনে জনে হদ (২৭) মোর,
পান খুজি (২৮) দুধ খুজি দুবাবের।
সমারি (২৯) বন্ধু পাংপারা (৩০),
লোকে কুদুমে (৩১) সব পুরা।

(১) সধিতেছি; (২) সাধনা; (৩) খোলসা করিয়া অর্থাৎ সরলচিত্তে; (৪) বাপে (৫) আসিত; (৬) ভাল; (৭) সুক্ষণে বা শুভক্ষণে, (৮) ভাল; (৯) উপস্থিত হইতাম; (১০) খেলিতাম; (১১) সন্তাস্তঘরে; (১২) দেখা পাইতাম; (১৩) খাইতাম; (১৪) ভগ্নী; (১৫) স্নেহপাত্র (১৬) কনিষ্ঠবউটী; (১৭) দোলাইত; (১৮) দেবতার; (১৯) ঘুরাণি; (২০) জেঠা; (২১) জেঠী; (২২) খুড়া; (২৩) খুড়ী; (২৪) কালীকুস্তারী ধান্য বিশেষের গাছের ন্যায় বাড়িতে থাকুক; (২৫) গোষ্ঠী প্রভৃতিতে; (২৬) ডাল; (২৭) হইত; (২৮) বাঞ্ছা করি; (২৯) সঙ্গীয়; (৩০) পাইবত; (৩১) কুটুম্বে।

কথা'নি (১) হলে মু-মিদা (২),
গীতে রঙে গম্ গলা।
মাদা জগা (৩) চুল ধরোক্ (৪),
মন্থরগা হ'দ দ্বিবা চোখ।
বেঙা (৫) হ'দ চোখ-ভং (৬),
মুজুঙ (৭) দাততুন (৮) হ'দ সং (৯)।
চেবার (১০) গম্ হ'দ উত্তানি (১১),
গোজনে বানেদ (১২) হাত্তানি (১৩)।
তঁদা পেজুং দেবগড়ন (১৪),
বারা অজার (১৫) বুকভরণ (১৬)।
ছানে শিক্যায় (১৭) গড়নে,
রূপে রঙে পিজুং সবখানে।
রাজা বাদার (১৮) পান খেজুং (১৯),
গুরু সাধি নাং (২০) পেজুং।
সাদি ঘরৎ উবুস্তুম,
পড়োয়া পণ্ডিত মুই হজুং।
দর্য্যা (২১) করলি (২২) পাই গণং (২৩),
আকাজে চান্ (২৪) তারা হাদে (২৫) গণং।
সাধি পেজুং মুই বিয়া (২৬),
লোকে মাদেত (২৭) হাজিয়া (২৮)
সর্ব্বলোকে পূজিত্তাক্ (২৯),
দে'লে (৩০) শত্তুরে (৩১) ভজদাক্ (৩২)।
হাদে পেজুং লেখাবর (৩৩);
কেইয়াৎ (৩৪) পেজুং রূপ-বর (৩৫)।
গীত চারিলামা ফুরেই যায়;
তঁদা সাধগুর আর বার।

---

(১) কথাগুলি; (২) মুখমিষ্ট; (৩) মাথা জুড়িয়া; (৪) ধরুক্; (৫) বক্র; (৬) ভ্রূ; (৭) সম্মুখে; (৮) দাঁতগুলি; (৯) সমান; (১০) দেখিবার; (১১) ওঁট অর্থাৎ ওষ্ঠখানি; (১২) নির্ম্মাণ করিত; (১৩) হাত খানি; (১৪) দেবতার গঠন; (১৫) বাহু ওসার অর্থাৎ বিস্তৃত; (১৬) বুক মাংসল; (১৭) সৌন্দর্য্যে; (১৮) বাটার; (১৯) খাইতাম; (২০) নাম; (২১) দরিয়া অর্থাৎ সমুদ্র; (২২) কষ্কর; (২৩) গণিতে পারিতাম; (২৪) চন্দ্র; (২৫) হাতে; (২৬) বিবাহ এখানে স্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত; (২৭) মাতাইত অর্থাৎ কথা বলিত (২৮) হাসিয়া; (২৯) পূজা করিত; (৩০) দেখিলে; (৩১) শত্রুতে; (৩২) ভজনা করিত; (৩৩) বিদ্যাধর; (৩৪) কায়ায় (৩৫) রূপেরবর।

(পঞ্চম ।)

তঁদাৎ বেরেই কাপড়ান,
ভজিলুং গোজেনর, চরণান ;
চরণে ছালামে ভজিলে,
সকল তিথ্য ফল পাই বেলে।
পাচফুল দান-ফল পেচ্চুংগোই,
রথে বলে (১) হচ্চুংগোই।
গোজেন-সর্ম্মুখে কর্ পাদং (২),
সাত পুত চাই যদি বর মাগং (৩)।
ডেনে (৪) মাগং ধনবর ;
বাঙে (৫) মাগং জনবর ;
ধনে সম্পদে সব পূরা (৬),
জুরি-পাত্তুংগোই (৭) হেৎ (৮) ঘোড়া।
যে বর মাগঙর (৯) মনের সাধ ;
সেই বর পেচ্চুংগোই হাদে হাদ্।
হাল্যা (১০) উবুজিলে (১১) লেই সাধি (১২),
জুম্মোয়া উবুজিলে তং সাধি (১৩),
দেওয়ান উবুজিলে বীর সাধি,
রাজা উবুজিলে সেথাভূয়া সাধি (১৪)।
কেইয়াৎ পেচ্চুং সাজানা (১৫),
ত্রিশ তিন জাতিথ্ন্ পেচ্চুংগোই খাজানা ;
খাদে (১৬) পালঙে (১৭) ব-খেচ্চুং (১৮),
ত্রিশ তিন জাতি-ভাজ্ (১৯) মুই পাত্তুং (২০) ;
যে বর মাগঙর মনের সাধ,
সে বর পেচ্চুং হাদে হাদ।
গীত পাঁচলামা ফুরেই যার,
তঁদা সাধঙর আরবার।

(১) গতরে, (২) হাত পাতি ; (৩) মাগি ; (৪) ডাইনে ; (৫) বামে ; (৬) পূর্ণ (৭) জুটাইতে পারিতাম ;গিরে ; (৮) হাতী ; (৯) মাগিতেছি ; (১০) কৃষক, (১১) জন্মিলে ; (১২) যেন 'লেই' অর্থাৎ ঝুড়ি বিশেষ পাই ; (১৩) যেন জুনের টংঘর পাই, (১৪) উঠিয়া যাইতে ; (১৫) সাজসজ্জা, (১৬) খাটে ; (১৭) পালঙ্কে ; (১৮) বাতাস খাইতাম অর্থাৎ বায়ুসেবনকরিতাম ; (১৯) ভাষা, (২০) আমি যেন পারি।

(ষষ্ঠ।)

তঁদাৎ বেরা কাপড় লই,
গোজেন ভজঙর গুজি হই (১)।
মাথা পাতি বস্তা লং (২),
সাত ভেই সাত ভোন্ (৩) বর মাগং।
হাদে ঢালি (৪) পানিয়ে (৫) ;
দিব মা বঝমতী (৬) সাক্ষিয়ে।
এগার হাজার চোরাশী সন,
ফল্না (৭) বারে সাধঙর একামন।
চরণে ছালামে ভজঙর,
যেবার ছালামি (৮) মেলঙর (৯) ;
গীত হয় লামা ফুরেয়ে,
বুঝিলে বুঝিব মানেয়ে।
দেবর কুলে (১০) দেব মানাই,
মানেই কুলে লোক মানাই ;
কুনি (১১) গেলা সঙ্গী ভেই,
সাধি সমারি (১২) চলি যেই (১৩)। ইতি

গোজেনের লামা এই সমাপ্ত হইল। পাঠক দেখিলেন, লেখকের ভক্তির গভীরতা কত! স্তোত্রের মধ্যে যে "এগার হাজার চোরাশী সন' এর উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় রচনার সময়। তবে হাজার কথাটা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস—এখানে শতকেই হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং ইহা মথার্থ। 'লামা'র ভাষায় জাতীয়তা পরিস্ফুট,—যদিও কথঞ্চিৎ সংস্কৃত বটে শিবচরণের লেখা পড়া কতদূর ছিল, জানি না ; তবে তিনি যে পূর্ব্ব জন্ম হইতে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ বক্তব্য নাই। সমালোচনার ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত রহিল।

বলিয়া রাখা উচিত যে, এই 'লামা'গুলি বস্তুত সঙ্গীত নহে। যে হিসাবে বেদকে গান বলা হয়, আমরা সেই হিসাবে—তান-লয় সহকারে গীত হয় বলিয়া ইহাদিগকেও সঙ্গীত শ্রেণীভুক্ত করিলাম। অন্যথা ইহাদের সঙ্গীত সমূহ

(১) নত হইয়া বসিয়া ; (২) আশীর্ব্বাদ লই ; (৩) ভগ্নী ; (৪) ঢালিতেছি ; (৫) জলকে, (৬) বসুমতী ; (৭) অমুক ; (৮) যাইবার অর্থাৎ বিদায়ের, সালাম ; (৯) মাগিতেছি ; (১০) দেবকুলে ; (১১) কোথায় ; (১২) সমাপ্ত করিয়া একসঙ্গে ; (১৩) চলিয়া যাই।

উভগীত।

"উভগীত" (১) আখ্যায় প্রসিদ্ধ। প্রাণের আকুল পিয়াসা মিটাইতে প্রায় সকলেই "উভগীতের" আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহাতে সাধকের হৃদয়োচ্ছ্বাস, উদাসীনের মরমকাহিনী বিরহীর প্রাণের জ্বালা, প্রেমিকের সরস বিশ্রম্ভালাপ অতি সংক্ষেপে, অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। এ সকল "উভগীতে" প্রায়ই দুই চরণের অধিক থাকে না। তাহাতেও আবার প্রথম চরণটি মাত্র পদমিলনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্ব ও উত্তরচরণে অর্থগত সম্বন্ধ দেখা যায় না। এবং "উভগীত" নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়, গায়কেরা উপসংহারে একটি সুদীর্ঘ 'কুই' (উ-উ-উ-উ) ধ্বনি দিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিয়া লয়। নিম্নে কয়টি প্রধান ভাবের গান সমুদয়ের নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

ভক্তিভাব।—

১। ফুলে তুলি আলামৎ (২)
সকল দেবতা ছালামৎ (৩)—উ-উ-উ-উ...

২। তাগল ধারেই (৪) থোছিলৎ (৫),
বচ্ছি (৬) সরস্বতী মর্জ্জিলৎ (৭)—উ-উ-উ-উ...

৩। থাড়ি (৮) লাগেই কালাম্ (৯) থুং (১০),
পঞ্চ সভা লক (১১) ছালাম থুং-উ-উ—উ-উ...

৪। আরেরে (১২) বানেল (১৩) যার জনম,
আগে ছালাম থুং তার চরণ—উ-উ-উ-উ...

৫। তঁদাৎ বেরেই কাপড়ান,
ভজগুর গোজেনর চরণান—উ-উ-উ-উ...

উদাস ভাব।—

১। সুপারি কাবি (১৪) থানে থান,
উদে (১৫) মনথুন (১৬) নানা গান—উ-উ-উ উ...

২। ছরমা (১৭) কুরারে (১৮) কি খুদ্ দিম্ (১৯),
উদাসী মনরে কি বুঝ্ দিম্—উ-উ-উ উ

(১) "উভগীত" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় দুরূহ। সম্ভবতঃ এ সকল সঙ্গীত পুরাকালে দম্পতী কর্ত্তৃক উদ্গীত হইত। উভয়ের গীত এই অর্থে "উভগীত" সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে।
(২) আদর্শ সূচক পটে (আলাম শব্দের পরিচয় ২৯৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে); (৩)সালাম দিতেছি। (৪) দায়ে ধার দিতেছি ; (৫) থরশিলে—ধারালশিলায় ; (৬) বস অর্থে ; (৭) মোর জিভে—আমার জিহ্বায় ; (৮) কাষ্ঠখণ্ড ; (৯) গাছের গড়া ; (১০) দিতেছি , (১১) লোক ; (১২) অতিপূর্ব্বে ; (১৩) প্রস্তুত করিল; (১৪) কাটি ;(১৫) উঠে; (১৬) মন হইতে; (১৭) লাজুক ;(১৮) মোরগকে; (১৯) দিব

৩। ছরমা কুরা ন খায় খুদ্
উদাসী মনে ন পায় বুঝ্—উ-উ-উ-উ···

৪। দনা (১) উজানি জুনি গেল
পুরাণি ভালেৎ (২) দিন উদি (৩) গেল—উ-উ-উ-উ··

৫। মাম্বারা (৪) খেইয়া (৫) ছাগল্যা ;
দয্যাৎ (৬) ন ভাজের পাগল্যা (৭)—উ-উ-উ-উ...

বিরহ ভাব।—

১। মদনা তদেগর ঠুট জ্বলে (৮),
রাঙা খাদিয়ে বুক জ্বলে—উ-উ-উ-উ···

২। কিজিং ছিনি (৯) পক্ষী গেল,
ভরন্দি বাজারৎ (১০) লক্ষ্মী গেল—উ-উ-উ-উ···

৩। চিগন (১১) মরিচা (১২) টানঙর (১৩) ;
দে'লে স্বপ্পনে (১৪) কানঙর (১৫)—উ-উ-উ-উ···

৪। দগরের (১৬) বেঙ্ওয়া কর্করি (১৭) ;
লইয়ে পরাণে ধরফরি—উ-উ-উ-উ...

৫। তোতেক (১৮) উড়ে ঝাকবলি (১৯)
রাখিৎ (২০) ন পারম্ (২১) থাক্ বলি—উ-উ-উ-উ...

প্রেমভাবাত্মক—গীতে অশ্লীল কথাগুলি অতি সাবধানে বিন্যস্ত হইলেও 'আদমের' মধ্যে কিংবা অনতিদূরে গান করা বয়োবৃদ্ধগণ পছন্দ করে না। 'কারণ ইহাতে যুবতীগণের চরিত্রভ্রষ্টা হওয়ার আশঙ্কা আছে।' প্রেমোদ্ভ্রান্ত যুবকগণ জুমক্ষেত্রে বা বিজন অরণ্যে মনের আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন কণ্ঠে পরিব্যক্ত করে। এসময়ে প্রণয়িনী ভিন্ন অপর কেহ সঙ্গে থাকে না,—অথবা প্রেমিক সম্পূর্ণ একাকীই থাকে। তাহারা কখনও বা গাইয়া বেড়ায়—

১। মাছে খেলো শিল-কেই (২২),
ন-দেলে তোরে, মোর চিগন বেই (২৩), ন-পারং থেই—উ-উ-উ-উ...

---

(১) প্রায় তিনদিকে পর্ব্বত-বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র ; (২)মঙ্গলের ; (৩) উঠিয়া ; (৪) ফল বিশেষ ; (৫) খাদক ; (৬) সমুদ্রে ; (৭) এক পর্ব্বপরিমিত বাঁশ—ভাসিতেছে না, (৮) মদনা তোতার ঠোঁট ঝক্মক করে ; (৯) উপত্যকাভূমি ছাড়িয়া ; (১০) পূর্ণ বাজারে ; (১১) ছোট ; (১২) বেত ; (১৩) টানিতেছি ; (১৪) স্বপ্নে দেখিয়া ; (১৫) কাঁদিতেছি ; (১৬) ডাকিতেছে ; (১৭) কর্করি নামক বেঙটি ; (১৮) তোতা ; (১৯) ঝাঁকে ঝাঁকে ; (২০) রাখিতে ; (২১) পারিতেছি না ; (২২) শিলের কলঙ্ক ; (২৩) যুবতীরমণীকে সরস সম্বোধন।

২। বনৎ দগরে হরিণ-ছ ;
ন-দেলে তোরে মরিব—উ-উ-উ-উ...

৩। উড়ের পক্ষী তল্ চেইয়া ;
ছাড়ি-নপারিম্ তর-মেইয়া—উ-উ-উ-উ...

৪। ডিঙি কুলেম্বি (১), ত-র্ঘাদৎ (২),
মোর আসল পরাণ্ডান্ (৩) ত-হাতৎ—উ-উ-উ-উ...

৫। এক পণ সুপারি হাজিব (৪),
তরে-মরেনি (৫) ছাজিব (৬)—উ-উ-উ-উ...ইত্যাদি।

এভাবের আর কতকগুলি সঙ্গীত আছে, তৎসমুদয় কেবল যুবতীদিগের চিত্ত-বিজয়ের নিমিত্ত সন্ধান করা হয়। যুবতীগণ তাদৃশ সম্মোহনবাণে বিমুগ্ধ হইলে, যখন মরমের চঞ্চলতায় সরমের কপাট খুলিয়া যায়, পাল্টাগানে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করে। ঈদৃশ সঙ্গীতালাপ অবশ্য যথোচিত সাবধানেই হইয়া থাকে। আবার তাহার ভাষাও কিরূপ সংযত এবং সতর্ক, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে।—

যুবক।—(চিগন ছরা, চিগন চেই (৭),
খুজি ডাগঙর (৮) চিগন বেই !
(ছরাছরি বিল হব ;)
তোর হাতর পান-খিলি হিল (৯) হব ?

যুবতী।—ইঁজরর মাদাৎ বই (১০) চান-চাগৈ (১১),
খাদী মেলি-দিয়ম্ (১২) পান খাগৈ (১৩)।

যুবক।—ধুন্দা (১৪) বাজেই (১৫) ত-দি (১৬) ;
এতক মাগিলুম ন-দিলি !

যুবতী।—শিলর কাঙারা (১৭) কলে ধর ;
পরাণে মাগিলে বলে ধর।

যুবক।—শিলর কাঙারা ডর গরে (১৮) ;
বলে ধরুম্ লাজ গরে।

(১) ধরিব অর্থাৎ বাঁধিব ; (২) তোমার ঘাটে ; (৩) প্রাণ পানি ; (৪) হারাণ যাইবে ; (৫) তোমার ও আমার মিলন কি ; (৬) সাজিবে অর্থাৎ শোভা পাইবে ; (৭) মাচ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ (৮) আপনা হইতে আহ্বান করিতেছি ; (৯) আস্বাদবিশিষ্ট ; (১০) মাথায় অর্থাৎ প্রান্তে বসিয়া ; (১১) চন্দ্র দেখ গিয়ে ; (১২) খুলিয়া দিব ; (১৩) খাও গিয়ে। (১৪) তামাক; (১৫) সাজাই ; (১৬) ত—তামাক সাজাইতে তন্নিয়ে যে কঙ্কর দেওয়া হয় ; (১৭) শিলাবাসী কাঁকড়া ; (১৮) ভয় করে।

যুবতী।—(মইন ঘরৎ থের (১) ঝাড়ি ;)
মুই থেইম্ (২) বেরা-ঘাজি (৩)।

যুবক।—বেল্যা নিগল্যে (৪) তিতি পেইক্ (৫),
থবাক্ (৬) বাজ্যোম্‌বই (৭) নিছিরোইৎ (৮)।

ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ভদ্র পরিপারে এতাদৃশী স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ব্বকালেও ছিল না, এবং এখনও নাই। বর্ত্তমানে সাধারণ চাক্‌মাগণের মধ্যেও কচিৎ মাত্র দেখা যায়।

প্রধান কয়ভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। এতদ্ভিন্ন কতিপয় গীতকে বিমিশ্র শ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহাতে বিমিশ্র ভাবের সমাবেশ থাকে। এগুলি বেশ লম্বা লম্বা ; তবে এক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের অর্থগত সম্বন্ধ খুব বিরল—কেবল ছড়ার ন্যায় কতকগুলি এলোমেলো কথায় গ্রথিত মাত্র। যথা :—

বিমিশ্র সঙ্গীত।

১। দীঘলি বাগৎ (৯) চরের মৈছ্ (১০),
সমারে (১১) বেড়াদন্ (১২) ননন্-ভৈজ্ (১৩)।
দগরের কুজুগী (১৪) ছন-বনৎ (১৫) ;
যত কূট্যারি (১৬) তার মনৎ (১৭)।
পানি থেই ন্যাই (১৮) পনথুন (১৯) ;
দুখ ন তুলিজ্ (২০) মনথুন (২১)।

২। বর্চ্ছি (২২) বিয়া (২৩) পলগে (২৪),
নোয়া জুম্মান্ (২৫) কাবি কলগে (২৬) ;
কলগৎ উদিল্ পদনা (২৭) ;
তদেগ্‌গ্ পুঝি মদনা,
মদনা তদেগে কদা কয়,
থাদৎ (২৮) উজেল্লি (২৯) সদাগর ;
মুজুনা (৩০) মাদি পিচ্ছালে (৩১) ;
ইথুন্‌বেচ (৩২) ভালা করিবো ঈশ্বরে।

---

(১) থড় ; (২) থাকিব ; (৩) বেড়া ঘেঁসিয়া ; (৪) অপরাহ্নে বা রাত্রিতে বাহির হইলে ; (৫) চাতক পক্ষী ; (৬) মক্কের ঠেস্ বিশেষ ; (৭) ঘা দিব গিয়ে ; (৮) নিশীথ রাত্রি ; (৯) (খালের) দীর্ঘ বাঁকে ; (১০) মহিষ, (১১) সঙ্গে ; (১২) বেড়াইতেছে ; (১৩) ঠাকুর ঝি ও জ্যেষ্ঠ ভাতৃবধূ, (১৪) স্ত্রীসজারু ; (১৫) ছনবনে ; (১৬) কূটবুদ্ধি ; (১৭) তাহার মনে ; (১৮) খাইয়া ; (১৯) পরিষ্কার থেকে ; (২০) দুঃখ তুলিও না ; (২১) মন হইতে ; (২২) বড়সী ; (২৩) বাহিয়া ; (২৪) লোফাইয়া ; (২৫) নূতন জুমখানি ; (২৬) গিরিগহ্বরে (২৭) জুমের পোড়ার পর নবোদ্গতে বাঁশ ; (২৮) ঘাটে ; (২৯) উপস্থিত হইল ; (৩০) এঁটেল ; (৩১) মাটি পিছলায় ; (৩২) ইহা হইতে বেশী।

৩। অজল (১) পাগর্য্যা নীজঝুপ্ (২) ;
দিন দিন পরেল্লি (৩) কোলিযুগ (৪),
কোলিযুগৎ সত্য নেই,
বুগ্ চিবি দেগেলে (৫) পত্তা (৬) নেই।

৪। ছরা উজানি তুত্তুং মাছ (৭) ;
গুজুরি (৮) পরেত্তি (৯) বৈশাখ মাস ;
বৈশাখ মাসেনি ধান্ কজা (১০) ;
উত্তর ধাকদ্ (১১) পানকদা (২) ;
কুজি কুজি (১৩) ছিনং (১৪) পান ;
উথ্যে পুগেদি (১৫) পুনং চান (১৬)।
পুনং চানে সাজ ধল্য (১৭) ;
হাজেতুং (১৮) মাজেতুং (১৯) লাজ গল্য (২০)।

৫। কুকুর পুছি হাদ্ দবা (২১),
হাদ্ দবা-ছ (২২) নাক্ দবা ;
নাক্দবা-ছ ভোমরা ;
লড়াই নিল (২৩) চোঙরা (২৪) ;
ধেল (২৫) চোঙরা গাং পার হোই (২৬) ;
সারেন্দ্ (২৭) কুনাদন্ (২৮) রং-বারোই (২৯) ;
এক্কোয়া সারেন্দ তিন্নোয়া খিল (৩০) ;
তিন্নোয়া খিলং তিন্নান্ জিল (৩১) ;
কানাই গাঙর (৩২) দোছরি (৩৩) ;
ইচা (৩৪) লামে সুর ধরি (৩৫) ;
বাচ্ছুন (৩৬) কাবি নয় কুড়ি,
নয়কুড়ি বাঁশর তুলং কাং (৩৭) ;

---

(১) উচ্চ ; (২) গাছবিশেষ, ঝোঁপ নীচ ; (৩) আসিয়া পড়িতেছে ; (৪) কলিযুগ ; (৫) বক্ষ চিরিয়া দেখাইলে ; (৬) প্রত্যয় ; (৭) দীর্ঘ ঠোঁটবিশিষ্ট মাছ ; (৮) গর্জ্জন করিয়া ; (৯) আসিয়া পড়িতেছে ; (১০) ধান্যবপন ; (১১) উত্তর পার্শ্বে ; (১২) পানের বর ; (১৩) কুঁচি ; (১৪) ছিন্ন করি (বহুবচনে) ; (১৫) পূর্ব্বদিকে উঠিয়াছে ; (১৬) পূর্ণচন্দ্র ; (১৭) সাঁজ ধরিল অর্থাৎ আঁধার হইল ; (১৮) হাসিতে ; (১৯ কথা বলিতে , (২০) লজ্জা করিল ; (২১) শ্বেতহস্তবিশিষ্ট ; (২২) হাতধলার বাচ্চা ; (২৩) তাড়াইয়া নিল ; (২৪) বড়হরিণ ; (২৫) পলাইল : (২৬) নদীপার হইয়া; (২৭) সারিন্দা , (২৮) কুঁদাইতেছে ; (২৯) সূতার ; (৩০) কীলক ; (৩১) তার ; (৩২) কানাই নদীর ; (৩৩) দুই নদীর সঙ্গমস্থান ; (৩৪) চিংড়ি ; (৩৫) সারি ধরিয়া ; (৩৬) বাঁশগুলি ; (৩৭) মঠ :

ক্যঙে দিলুম্ চেরাগে (১) ;
দেবায় কল্য পেরাগে (২) ;
চেরাগর ধূমা (৩) লংকানি (৪) ;
উঠ্যে বাজারৎ (৫) অংবালি (৬)।
অংবালি বাজারৎ কি উঠ্যে ?
চিগন্ চিগন্ তোবালে (৭) উঠ্যে। ইত্যাদি।

এই যে সকল সঙ্গীতের বিবরণ প্রদত্ত হইল, বলা বাহুল্য, তাহাদের সহিত কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

প্রথমেই বলিয়াছি, ইহারা যাত্রা, কবির গান প্রভৃতিতে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করে। বিদেশীয় গায়কদল আসিয়া বৎসর বৎসর এই সুযোগে প্রভূত অর্থ লইয়া যায়, অথচ নিজেদের মধ্যে তাহা রক্ষা করিবার কাহারও তাদৃশী চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয় না। কেবল তরণীসেন নামক "লার্ম্মা গোছা"র জনৈক দেওয়াননন্দন কয়েকবৎসর ধরিয়া এক যাত্রার দল চালাইয়াছিলেন। তিনি তেমন উন্নতি দেখাইতে না পারিলেও, তদীয় উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রশংসাযোগ্য, সন্দেহ নাই। ইহাতে শিক্ষিত সাধারণের যোগ থাকিলে, আশানুরূপ উন্নতির আশা করা যাইতে পারিত। সম্প্রতি কামাখ্যা নামে অপর এক চাক্‌মা যুবক এপক্ষে মনোযোগ দিয়াছে। তাহার শক্তি সামান্য হইলেও, আমরা হৃদয়ের সহিত তাহার সাফল্য কামনা করি। নিকৃষ্ট বলিয়া অগ্রাহ্য করা অতি সহজ, তাহাকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতেই যাহা কিছু কষ্ট। উপযুক্ত উৎসাহ ও সহায়তা পাইলে, ইহা সমাজের বহু অর্থ রক্ষা করিতে পারিবে। তাই আমি সর্ব্বশেষে এতৎপ্রতি সমগ্র চাক্‌মা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত সমাপ্ত করিলাম।

সঙ্গীতে অনুরাগ।

---

(১) প্রদীপ; (২) দেবতায় বজ্রপাত করিল; (৩) ধূম্র; (৪) চুয়াইয়া মদ্য পড়িবারপাত্রের মুখে যে নেকড়া মুড়িয়া দেওয়া হয়; (৫) বাজারে; (৬) কর্ণাভরণ; (৭) তোয়ালে।

উপসংহার।

(১) বাঙ্গালী-সংস্রব—(২) মিশনারী-চেষ্টা

এবং

(৩) ইংরাজাধিকারের ফল।

—:*:—

[১]

আমি নিজেও বাঙ্গালী; সুতরাং আমার মুখে বাঙ্গালী-চরিত্রের সমালোচনা তেমন শোভন না হওয়ারই কথা। কেননা, বাঙ্গালীসুলভ দোষগুণ ত আর আমাকে ছাড়িয়া নহে! তবে যদি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া, আমার দ্বারা স্বীয় সমাজের কোন কলঙ্ককথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আশা করি—বঙ্গবাসিসমাজ সেই আত্মনিন্দার নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। কতিপয় নীচমনা লেখক বাঙ্গালী জাতিকে যাদৃশ কুৎসিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন; বাঙ্গালী-চরিত্র যে তাহা হইতে বহু পরিমাণে উন্নত, একথা অসঙ্কোচে বলা যায়। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায় কি কর্ম্মতৎপরতায় জগতে বাঙ্গালীর তুলনা মেলা কঠিন এবং তাহাদের শক্তিও অসামান্য। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণেরও অভাব নাই। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতাও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে, তাহারা আপন দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া স্বকীয় সামর্থ্য প্রকাশে সক্ষম। বর্ত্তমান দেশব্যাপী আন্দোলন হইতে মদীয় অস্তব্যের সত্যাসত্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ জন বিম্‌সের কথায়* বলিতে গেলে—"চাকমাগণ অর্দ্ধবাঙ্গালী।" বস্তুতঃ ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহারে বাঙ্গালীর অনুকরণ যথেষ্টরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এবং ইহাদের ভাষাও যে বাঙ্গলা ভাষার বিকৃত অবস্থা মাত্র, তাহাও যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন চাকমা-

* Letter No. 227H. Dated 5-9-1879.

দিগের (উপাধি ব্যতিরিক্ত) নামগুলিও এমন বাঙ্গালী-ভাবাপন্ন যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে বাঙ্গালী হইতে পৃথক্ করা একরূপ অসম্ভব।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইহাদের এই বাঙ্গালী অনুকরণ কতদূর সুফলপ্রসূ হইয়াছে। ১৮৭২ ইংরাজীর ১লা জুলাই কাপ্তেন লুইন বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন * "চাক্‌মাগণ বাঙ্গলা বলে। বহু বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গালী কৃষকদিগের সহিত অবাধ সম্মিলনে আমাদের রাজ্যের মধ্যে তাহারাই অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের কোন জাতির মধ্যে কাহাকেও শাসনকর্ত্তার কার্য্যের বাধা ঘটাইতে দেখি নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত, তাহারা আর মনঃপ্রাণে চাক্‌মা জাতিতে থাকিতে চাহে না। · · ··· পক্ষান্তরে প্রায় সমুদয় চাক্‌মা দেওয়ান নূনাধিক পরিমাণে বাঙ্গালীদিগের সহিত বসবাস করিতেছেন। ইহাতে দ্বিবিধ ফল আছে। দেওয়ান ও হেড্‌ম্যানগণ তাঁহাদের প্রজাগণকে চাপিয়া রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধিক লাভভাগী হন; এবং তাহাদিগকে অধিকতর শাসনেও রাখা যায়। অপরদিকে চাক্‌মাদিগের মধ্যে এমন এক তেজস্কর ভাব জন্মিতেছে যে, তাহারা দেওয়ানগণ হইতে স্বকীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে প্রথমে চেষ্টা করিবে।" অনন্তর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন মিঃ পাউয়ার কমিশনার মহোদয়কে যে পত্র* লেখেন, তাহাতেও "বাঙ্গালী ও চাক্‌মাদিগের সম্মিলনে চাষে"র উল্লেখ আছে। ১৮৭৯ ইংরাজিতে কমিশনার বাহাদুর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টে যে পত্র (Letter No. 227H) লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা আশা করি, চাক্‌মাগণ হাল চাষে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। কেননা তাহারা অর্দ্ধবাঙ্গালী; তাই মঘদের অপেক্ষা হালচাষে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।" সুতরাং চাক্‌মাদিগের হালচাষের এই উন্নতিকে বাঙ্গালী সংসর্গের উৎকৃষ্ট ফল বই আর কিছুই বলা যায় না।

* Letter No. 532.

* Letter No. 472.

কেবল ইহা নয়, এরূপ শত শত প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে, যাহাতে দেখা যাইবে যে,—বাঙ্গালীর সাহচর্য্যই চাক্‌মাদিগের বর্ত্তমান উন্নতির মূল। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভাগীয় কমিশনারগণ রাঙামাটি গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বোর্ডিং স্কুলে বাঙ্গালীছাত্রের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের সদুদ্দেশ্যে অনিষ্টেরই আশঙ্কা ছিল। বাঙ্গালী ছাত্রের প্রতিযোগিতা না পাইলে চাক্‌মাছাত্রদিগের বর্ত্তমান উন্নতিও যে বহু-

পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহা বুঝিতে পারিয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের তাদৃশ প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতেছিলেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বৌদ্ধাধিকার প্রবল থাকিলেও চাক্‌মাসমাজ বাঙ্গালী অনুকরণে অচিরে চট্টগ্রামীয় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গ্রন্থাংশে আমরা দেখাইয়াছি, "কালিন্দী রাণী বাঙ্গালী মন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত" "রাজা হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালী পদ্ধতির লোক" "বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁহার এত ঝোঁক যে, তিনি হিন্দুপর্ব্ব এবং ভোজাদিও পালন করিয়া থাকেন", "রাজা আপনাকে হিন্দু বাঙ্গালা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াসী" ইত্যাদি ইত্যাদি নানাকথা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালী সংস্রবের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এতৎসঙ্গে কমিশনার মিঃ জন, বিম্‌সের আরও কিঞ্চিৎ অভিমত * দেখাইয়া রাখি।—"(ডিপুটি কমিশনার) কাপ্তেন গর্ডনের রিপোর্টে দেখা যায়, পাহাড়ীদিগের মধ্যে সম্প্রতি এমন একভাব জন্মিয়াছে যে, তাহারা দীর্ঘতর সময় ধরিয়া একস্থানে তাহাদের চিফ্ বা হেড্‌ম্যানের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিতে চাহে না। এই ভাব সম্ভবতঃ বাঙ্গালীদিগের প্রাধান্যে ঘটিয়াছে। এই বাঙ্গালীদিগের পরিচয় তাঁহার নিজের কথায় "Who are striving to impress the simple hillmen with that spirit of referring everything to law courts and questioning the validity of every order of an executive officer, which is so strong among themselves. অর্থাৎ যাহারা এই সরল স্বভাব পাহাড়ীদিগের মনে প্রত্যেক বিষয়েই আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ এবং শাসনকর্ত্তৃগণের আদেশের বৈধতা বিচার করিবার ভাব—যাহা তাহাদিগের নিজেদের মনেও খুব প্রবল, উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। আমরা রোয়াজা (অর্থাৎ হেড্‌ম্যান) প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিলে ইহারা অধিকতররূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।" ইত্যাদি।

* Letter No. 21H, 11-2-1879.

প্রাগুদ্ধৃত মন্তব্যে কেবল ঈর্ষ্যাপ্রকাশ ছাড়া অপর কোন যুক্তি আছে বলিয়া ত মনে হয় না। যে বাঙ্গালীদের সংমিশ্রণে চাক্‌মাদিগের এতাদৃশী উন্নতি, যাহাদের অনুকরণে মুমূর্ষু জাতি নবজীবন লাভ করিয়া সভ্যতার দাবি করিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই বাঙ্গালী সংসর্গের প্রতি দোষারোপ করা আদৌ সঙ্গত বোধ হয় না। মিঃ বিম্‌সের অন্যান্য উক্তির সহিতও একমত হওয়া যায় না। বাঙ্গালী প্রাধান্য কি তাহাদের বাসস্থান স্থায়ী রাখিবার সাহায্য করিয়াছে,

অথবা তাহাদিগকে উদাসীন প্রায় ঘুরাইয়াছে ও ঘুরাইতেছে? পাঠকবর্গ দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহারা জুমের জন্য কেমন এখানে ওখানে ঘুরিতেছিল! এখনও যাহারা লাঙ্গল ধরে নাই, তাহাদের সেই দুর্গতি;—দুই বৎসর একস্থানে স্থায়িরূপে থাকিবার উপায় নাই! বাঙ্গালীই ইহাদিগকে প্রথমে চাষ শিক্ষা দেয়। অদ্যাপি অনেকে বাঙ্গালীর সহায়তা ভিন্ন নিজেরা স্বাধীনভাবে চাষ চালাইতে পারে না। যাহারা চাষ ধরিয়াছে, তাহারা স্থায়ী বসতিও স্থাপন করিয়াছে। যদিও চাষী পাহাড়ীর মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও জুমিয়ার ন্যায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তাহা সম্ভবতঃ ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবে। সুতরাং বাঙ্গালীর সংস্রবে ইহাদিগের স্থিতিশীলতার ক্ষতি হইয়াছে, এ কথা নিতান্তই ভিত্তিহীন।

মনুষ্যতালুকের সৃষ্টিতে অবশ্য রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। ইহা যদি বাঙ্গালী-পরামর্শপ্রসূত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রণাদাতার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অজ্ঞতা লইয়া কোন এক জাতির উপর দোষারোপ করা কদাপি ন্যায়সঙ্গত নহে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালী সমাজের অপর এক দুর্নাম অর্থপিশাচ মোক্তার ও মহাজনদিগের গর্হিত উৎপীড়ন। উপযুক্ত পানে জলৌকাও তৃপ্ত হয়, কিন্তু ইহাদিগের আকর্ষণ পেট ফাটিয়া গেলেও, ছাড়িবার নহে! যাহাকে একবার পথে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পরিতুষ্ট হইলেও, হতভাগার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল বলিতে হয়।

কাপ্তেন লুইন "ফ্লাই অন্ দি হুইলে" লিখিয়াছেন * "আমি নীচ বাঙ্গালী মোক্তারদিগের দ্বারা অতিশয় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়াছিলাম। তাহারা পাহাড়ীদিগের অজ্ঞতা ও সারল্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিল। ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া, তাহারা ইহাদিগকে মোকর্দ্দমা দায়ের করিতে উত্তেজিত করিত।" "ধূর্ত্ত বাঙ্গালী মোক্তার ও টর্ণিগণ এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের গরলস্বরূপ। তাহাদিগকে এখান হইতে তাড়াইতে আমি কদাপি শৈথিল্য প্রকাশ করি নাই। (সম্ভবতঃ মহামুনি) মেলার পরে আমি এমন এক উপযুক্ত কারণ পাইয়াছিলাম, যদ্দ্বারা তাহাদের অবশিষ্ট তিনজনকেই ষ্টীমারযোগে এদেশ হইতে তাড়াইবার সুবিধা হইয়াছিল। সাধারণতঃ যেমন হয়, তাহারাও তদ্রূপ কমিশনার ও গভর্ণমেণ্ট সমীপে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল। তাহাতে আমার নিকট হইতে যে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যেও আমি তাহাদিগকে ছাড়ি নাই। পাহাড়ীদিগের

* Page 284.

Page 336-337.

অজ্ঞতা এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে কলহ বাধাইয়া ও মোকর্দ্দমা তুলিয়া কিরূপে তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত এবং আমার বিচারের বিরুদ্ধে আইনের কূটতর্ক ও বিপরীত বর্ণনায় আপিল করিয়া কিরূপে গভর্ণমেণ্টের শাসন শক্তিকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা পাইত, আমি তৎসমস্তই দেখাইয়াছিলাম। ··· ··· চতুর বাঙ্গালিগণ পাহাড়ীদিগের প্রতি অত্যাচার পূর্ব্বক টাকা বাহির করিবার জন্য আমাদের আইনকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিত।"

সত্য কথা বলিতে কি, এই বর্ণনার কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। ভুক্তভোগী অনেক সাক্ষী অদ্যাপি পাওয়া যায়। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যবর্ত্তী মোক্তারাদির প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাও অনেকদিন গত হইতে চলিল; তথাপি এত বৎসর পরেও সেই অত্যাচার ক্ষত আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উত্তমর্ণদিগের সুদের হারও শতকরা বার্ষিক বার টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু অধুনা সেই আবরণমাত্র প্রকাশ্যতঃ রাখিয়া মহাজনদিগের উৎপীড়ন অবাধে চলিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিতব্যয়িতার অভাবে পাহাড়ীরা প্রায়শঃই ঋণ করিতে বাধ্য হয়। যত টাকা ধার করিবে, খতে তাহার দেড়গুণ লিখিয়া দিতে হইবে, ইহা অদ্যতা চিরাগত পদ্ধতি। অন্যথা কোন মহাজন হইতেই সাধারণ লোকে কর্জ্জ পায় না। সুদ অবশ্য নিয়মাতিরিক্ত নয়। কেবল ইহা নহে, বৎসরান্তে চক্রবৃদ্ধিক্রমে সুদ-আসল যোগ করিয়া পুনরায় তাহাদিগ হইতে উক্ত দেড় গুণের খৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে দেয় টাকা এককালীন পরিশোধের শক্তি না থাকিলে অধমর্ণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মহাজনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন রাঙামাটী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহাশয় একদা তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, এমনও একদিন গিয়াছে,—যে মহাজনেরা মৃতঅধমর্ণের উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার শ্মশানোত্থিত ধূম যেইদিকে গিয়াছিল, সেই প্রতিবেশীদের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিত! উঃ কি ভয়ানক ব্যবস্থা! ইহাকেই "বে-আইনী মুলুকে"র বিধি বলা যাইতে পারে বটে! এখানকার মহাজনেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান উপলক্ষ করিয়া বসিয়া আছে। প্রজ্ঞাদৃষ্টিশালী দেখিতে পান—নির্ম্মম দস্যু ছদ্মবেশে শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে! এ সম্বন্ধে আমি নিজে আর কিছু না বলিয়া কাপ্তেন লুইনের "ফ্লাই অন্ দি হুইল" হইতে আর একটি চিত্র উঠাইয়া দিতেছি, যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি

অবাস্তব কোনও ঘটনা জানাইব না। ইহা কাল্পনিক নহে; আমি ইহা হইতে আরও শোচনীয় উদাহরণ জানি। "জনৈক পাহাড়ী মহাজনের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিলে, মহাজন বলিল,—বন্ধু, বেশ ভালই হইল; এই দেখ—আমি তোমার খৎ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।" এই বলিয়া সে উক্ত পাহাড়ীর খতের বদলে অপর এক পুরাতন কাগজ ছিঁড়িল। ঐ বেচারী লিখিতে বা পড়িতে জানে না; সুতরাং মহাজনের দায় হইতে মুক্ত হইল ভাবিয়া, আনন্দের সহিত ঘরে গেল।

Page 338.

"মহাজন কিছুকাল পরে উক্ত খৎ মূলে সেই পাহাড়ীর বিরুদ্ধে সুদ ও আসলের চক্রবৃদ্ধি কষিয়া নালিশ উপস্থিত করে। এই পাহাড়ীকে আমরা নীল চন্দ্র বলিব। উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথানিয়মে নীলচন্দ্রের নামে সমন জারীও করা হয়। মোকর্দ্দমার শুনানির দিন মহাজন তদীয় নৌকার মধ্যে থাকিয়া নীলচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরে তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অনুরাগপূর্ণ মুখ এবং স্বরে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করণাভিপ্রায়ে বলিল, 'প্রিয়বন্ধু, সত্যই আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আমার ভ্রমে তুমি কত কষ্ট ও পথশ্রম পাইয়াছ। তোমার আর আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। সমনখানি আমাকে দাও। আমি সাহেবকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিব। ততক্ষণ তুমি আমার ঘরে গিয়া খাও এবং মদ্যপান কর।'

এইরূপে সেই হতভাগ্য মাছি আহার ও পানের নিমিত্ত গেল আর সে সময়ে চতুর উর্ণনাভ আদালতে চলিল। এদিকে যথাসময়ে মোকর্দ্দমার ডাক হইল, নীলচন্দ্রকে উপস্থিত না পাইয়া মহাজনের সম্পূর্ণ দাবিতে মোকর্দ্দমা একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। অনন্তর মহাজন স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদীয় দায়িককে আতিথেয়তা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী পাঠাইয়া দিল। আপিলের ম্যাদ গত হওয়ার পূর্ব্বে তাহাকে আর কোন কথা বা চিহ্ন জানাইল না। ইহাতে ডিক্রী বলবৎ হইয়া দাঁড়াইল। অনন্তর ঐ দুর্ভাগ্য পাহাড়ীর মস্তকোপরি ঝঞ্ঝাবাত ঘুরিতে লাগিল! সে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, অপরিমেয় ঋণে ভারাক্রান্ত হইয়াছে! এরূপ কর্জ্জে সে আর কোন দিন পড়ে নাই এবং পরিশোধ করিবারও আশা করিতে পারে না। কাজেই সে প্রকৃত পক্ষে অবশিষ্ট জীবনের নিমিত্ত মহাজনের দাস হইয়া রহিল। যদিও এ পাহাড়ে প্রকৃত ন্যায়পর উত্তমর্ণও আছেন, কিন্তু তথাকথিত মহাজনের সংখ্যাই বিশেষ প্রবল। বস্তুতঃ তাহাদিগের এতাদৃশ জঘন্য ব্যবহার কখনই মার্জ্জনীয় নহে। তাহাদের কৈফিয়ত যে, আমরা ব্যক্তিবিশেষের সহিত এরূপ করি বটে, কিন্তু আবার অনেকেই

আমাদিগকে প্রতারিত করে। গড়ে হিসাব করিলে, আমরা যে বেশী কিছু লাভ করি, এমত নহে, বস্তুতঃ অনেকেই যে মহাজনের টাকা 'বেমালুম হজম' করিয়া ফেলে, ইহাও অসত্য নহে। শুনিয়াছি, সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট মহাজনদিগের উৎপীড়ন সংবাদে ব্যথিত হইয়া অধমর্ণদিগকে এক সময়ে ২৮০০০ হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক টাকাও আদায় হয় নাই,—'অন্য পরে কা কথা?' সুতরাং এরূপস্থলে অল্পসুদে কুসীদ ব্যবসায়ীদের পোষাইবে কেন? তাই বলিয়া তাহারা যে রামের চাপড় খাইয়া শ্যামের বুকে ছুরি বসাইবে, ইহাও সর্ব্বতোভাবে গর্হিত ও নিন্দনীয়! রাজা ভুবনমোহন রায় মহোদয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছে, কোনও উত্তমর্ণ অধমর্ণের সম্বৎসরোপযোগী খাদ্য সংস্থান না রাখিয়া মাল ক্রোক করিতে পারিবে না। ইহাতেও নিরুপায় পাহাড়ীদিগের অশেষ উপকার হইয়াছে। সুখের বিষয়, সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট পাহাড়ীদিগকে স্বয়ং ঋণ দিয়া মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। আশা আছে, এতদ্দ্বারা তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কারণ অচিরেই বিদূরিত হইবে।

কাপ্তেন লুইন বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে আর যে সব মন্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন ঈর্ষ্যা প্রসূত। বস্তুতঃ তিনি বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃতি অঙ্কনে সাতিশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কোন কোন স্থানে তিনি বাঙ্গালীদের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন করিতেও চেষ্টা পাইয়াছেন। বোধ হয়, বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ তদীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া অভিযোগাদি করিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি "ফ্লাই অন্ দি হুইলে" লিখিয়াছেন * "বাঙ্গালী বাবুরা যখন দেখিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে আবেদন ও অভিযোগ সমুদয় পণ্ড হইয়া গেল, তখন তাঁহারা একযোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।" ... ... "সুতরাং আমি বার্ম্মিস ক্লার্ক আনাইয়াছিলাম।" কিন্তু আমরা তদানীন্তন রাজকর্ম্মচারী (বর্ত্তমান সব্ ডেপুটী কালেক্টর) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানের মুখে শুনিতে পাই,—'মিঃ লুইন বাঙ্গালিগণকে তাড়াইয়া তাহাদের পদে (আরাকানী) মঘ কেরাণী নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের দ্বারা, কাজ চলেনা দেখিয়া, বাঙ্গালীদিগকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং তাহাদের পদোন্নতি করিয়া দিয়া মনোমালিন্য দূর করেন। হায়, তথাপি তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন নাই। অপর এক স্থলে * লিখিয়াছেন,—"আমি একজন ভিন্ন অপর সকল বাঙ্গালী বাবু হইতে পৃথক্ ছিলাম। ধর্ম্মাধিকরণে মদীয় উপযোগিতা

* Page 361.

Page 363.

লোকে তখন বুঝিল! বস্তুতঃ তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা সমর্থনকল্পে যাহাই লিখুন না কেন, তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করিবার স্থান ইহা নহে। তিনি বাঙ্গালা বাবুগণের সম্পর্ক কিরূপে ছাড়িয়াছিলেন, তাহা তখনকার বাঙ্গালীসমাজ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তদানীন্তন কর্ম্মচারিগণ হইতে অধুনা এরূপ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়।

যাক্, বাঙ্গালী চরিত্রের সাফাই গাইতে গিয়া অনেক বাজে কথা বকিলাম। মোটকথা, বাঙ্গালী-সংস্রবে চাক্‌মাদিগের ইষ্টানিষ্ট দুই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীদের হইতে তাহারা ভাষা, শিক্ষা, চাষ ও বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল দুর্লভরত্ন লাভ করিয়া আজ সভ্য সমাজে পরিচিত হইতেছে, তজ্জন্য তাহারা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী-জীবনের স্বভাবগত যে দোষ, তাহাও তাহাদিগেতে সংক্রামিত না হইয়া যায় নাই। আমরা পাশ্চাত্যজাতির কাছে যে পরিমাণে বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়াছি, চাক্‌মাগণও আমাদের সঙ্গফলে প্রায় তৎসমস্তই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। অবশ্য ইহাতে ইংরেজাধিকারও মুখ্যভাবে কম সাহায্য করে নাই। আর একটি দুষ্টানুকরণ—চাকরী। কিন্তু ইহাকে প্রচলিত শিক্ষারই ফল বলিতে হইবে। ফলতঃ বাঙ্গালীর সংসর্গে যা কিছু সামান্য অনিষ্ট ঘটিলেও, তাহাদের দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ হইয়াছে। নতুবা তাহাদের বর্ত্তমান অভ্যুদয় কদাপি সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রমাণ পার্ব্বতীয় অপরাপর জাতি এযাবৎ বহুদূরে পড়িয়া আছে।

এই চাক্‌মা ও বাঙ্গালীর সংস্রব আরম্ভ হইয়াছে, আজ কালের কথা নহে। "দেঙ্গ্যাওয়াদি আরে দফুং" এ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও এতৎ সম্বন্ধে পরিচয় পাইয়াছি। তখন তাহাদিগের মধ্যে যে একতার ভাব দেখা গিয়াছিল, আরও বহুকাল পূর্ব্বে যে তথাকথিত সংস্রব আরম্ভ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ক্রমে পরস্পরের সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ট হয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বাঙ্গালিগণ চাক্‌মা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। যাহা হউক বড়ই সুখের কথা যে, বর্ত্তমানে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ভাষায়, কথায় শিক্ষাদাতা বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন বাঙ্গালী তাহাদের "বাঙাল" আখ্যায়—বাঙ্গালীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন মনে করিয়া দুঃখিত হয়। কিন্তু আমরা তাহা সরল প্রাণের মধুর সম্ভাষণ বোধে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরাও পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে 'বাঙাল' ডাকেন এবং উড়িষ্যাবাসীদিগকে আমরা 'উড়ে' বা 'উড়িয়া' বলি, তজ্জন্য কাহারও মনে কষ্টগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

(২)

মনুষ্যসমাজের অধ্যুষিত ভূমণ্ডলের এমন কোনও স্থান আছে কিনা জানিনা, যথায় খৃষ্টিয়ান মিশনারী মহোদয়গণের ধর্ম্মালোকরশ্মি বিকীর্ণ হয় নাই। পথে —ঘাটে—বনে—জঙ্গলে—সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি। অবিচলিত উৎসাহে —অক্লান্ত অধ্যবসায়ে যাবতীয় বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-বিস্তার চেষ্টায় তৎপর দেখা যায়। বস্তুতঃ যাঁহারা ঈদৃশী সাধনায় নিরত, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সাহায্যকারিগণ মহামতি যীশুর প্রকৃত আশীর্ব্বাদভাজন ও সমাজের প্রশংসার পাত্র।

সম্ভবতঃ সকলেই অবগত আছেন যে, এই মিশনারীসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে "লণ্ডন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি" সর্ব্বপ্রথম ১৮১২ খৃষ্টাব্দে আসিয়া চট্টগ্রাম ও এই পার্ব্বত্য প্রদেশের দক্ষিণাংশে কার্য্যারম্ভ করেন। এই প্রথম উদ্যোক্তার নাম রেভঃ, ডি, ক্রুইন। কিন্তু তিনি অতি অল্পদিন পরে তাঁহারই কর্ত্তৃক দীক্ষিত জনৈক মঘ-বালকহস্তে নিহত হন। তৎপরবর্ত্তী মিশ-নারী রেভঃ পিককও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর রেভঃ ফিঙ্ক আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তদীয় চেষ্টায় দুই বৎসরের মধ্যেই কক্সবাজার ও তৎসমীপবর্ত্তী কয়েকটী গির্জ্জায় ১৬৩ জন ধর্ম্মান্তরিত পাহাড়ী যোগদান করিতেছিল, কিন্তু প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং অধিকাংশ জ্বর ও যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে রেভঃ ফিঙ্কের চেষ্টা ও অধ্যবসায় সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। অতঃপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে এই সম্প্রদায়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কেবল "ফ্লাই অন্ দি হুইলে" দেখিতে পাই, কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন,—এখানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ জনৈক Page 379.

মিশনারীকে পাইবার জন্য, আমি কলিকাতাবাসী মিশনারীদের সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়াছিলাম। আমি যখন বুঝিলাম যে, এ সকল সরল জড়োপাসক-দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার নিজ হইতে উক্ত মিশনারীর অর্দ্ধেক বেতন দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। পরন্তু এ বিষয়ে আমি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সম্মতি প্রদান করি নাই।" ইতি—ইহা ১৮৬১ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের কথা হইলেও, চেষ্টা বা সঙ্কল্পমাত্র ফলে কিছুই হয় নাই। অধিকন্তু আমরা এই শেষ কয় পংক্তি হইতে তদীয় অন্তঃকরণ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম।—তিনি স্বধর্ম্মপ্রেমে এমনি মাতোয়ারা ছিলেন যে, ভিক্ষুগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রেভঃ ডি, জুজ্ চট্টগ্রামের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি বৎসরে একবার মাত্র এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রচারার্থ পর্য্যটন করিতেন, তাহাতেও নাকি তিনি জ্বরে এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন যে, অবশেষে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর রেভঃ ম্যাকৃলিন তদীয় স্থলাভিষিক্ত হন। তখন হইতে এই সম্প্রদায় প্রকৃত ফলপ্রসূ হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৫ অব্দে ম্যাকৃলিন দীর্ঘ বিদায় লইয়া স্বদেশে যান; প্রত্যাবর্ত্তন পথে 'পোর্টসেইডে' নিউমোনিয়ায় (Pneumonia) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার পর রেভঃ ডোনেল্ড কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি নিয়মিতরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৯ অব্দে অবসর গ্রহণ কালে তিনখানি 'আউট্ ষ্টেসন' এবং ৭৫ জন মেম্বরবিশিষ্ট এক-খানি গির্জ্জা রাখিয়া যান।

বলা বাহুল্য, মিশনারিগণের প্রাগুক্ত যাবতীয় চেষ্টা প্রধানতঃ চট্টগ্রামেই চলিয়াছিল। ইহাতে চাকমা সম্প্রদায়ের দূরের কথা, এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের সহিতও সম্বন্ধ অতি সামান্য ছিল। অনন্তর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রেভঃ জর্জ্জ হিউজ এবং তদীয় পত্নী আসিয়া উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহারা এই মিশন কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে উভয়েই ইংলণ্ড এবং ওয়েল্সে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের কার্য্যে, চট্টগ্রামে থাকিয়া সাময়িক পরিদর্শন অপেক্ষা নিকটে থাকিতে পারিলেই অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত তাঁহারা রাঙ্গামাটিতে অত্রত্য হেড্ কোয়ার্টার স্থাপন করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন এখানে বর্ত্তমান সুরম্য 'বাংলা' নির্ম্মিত হয়, তখন হইতেই তাঁহাদের কার্য্যালয় এখানে স্থায়িরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃই তাঁহাদের আশা সফলতা লাভ করিয়াছে, সেই বৎসরেরই শেষভাগে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়-সংখ্যা ৬০০ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কার্য্যভার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি একজন ইউ-রোপীয় সহকারীও পাইলেন। তাঁহারা এখানে শিক্ষা-সাহায্যেও মনোযোগ অর্পণ করেন। চৌদ্দখানি গ্রামে পাঠশালা খোলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিন-খানিতে 'বোর্ডিং'ও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা সত্বেও তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট হইল। প্রচারের সুবিধার্থ অনন্তর তাঁহারা চিকিৎসা-সাহায্য উন্মুক্ত করিলেন। তজ্জন্য লণ্ডনের সুশিক্ষিত ডাক্তার জি, ও, টেইলর এম, বি,; এফ, আর, পি, এস্, সস্ত্রীক আসিয়া যোগদান করেন। তদীয় পত্নীও একজন ভদ্রজা সুশিক্ষিতা ধাত্রী, ইতোপূর্ব্বে লণ্ডন নগরের কোন সুপ্রসিদ্ধ

চিকিৎসাগারে "সিষ্টার" (Sister) স্বরূপে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯০৬ অব্দে তাঁহারা চন্দ্রঘোনায় দ্বিতীয় কার্য্যক্ষেত্র খোলেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ "লুইনের পাহাড়ে"র উপর অপর এক রমণীয় 'বাংলা' বিনির্ম্মিত হয়। এই ষ্টেসনের ভার ডাঃ টেইলার এবং তদীয় পত্নীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের চিকিৎসা-সাহায্যে কেবল পার্ব্বত্যগণ নহে, প্রতিবেশী হিন্দুমুসলমান অধিবাসিগণও প্রভূত উপকার লাভ করিতেছে। পরবর্ত্তী বৎসর তাঁহারা এক 'আউট ডোর ডিস্পেন্সরী' খুলিয়াছেন, গত সনে এক সুবৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত (Arthington) 'হস্পিটাল' প্রস্তুত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই নূতন ষ্টেসনের নিমিত্ত যদিও তাঁহাদের অর্দ্ধলক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইতোমধ্যেই বহুসহস্র পীড়িত ব্যক্তি অশেষ উপকার লাভ করিয়াছে।

মিশন সম্প্রদায়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী একরূপ প্রদত্ত হইল, এক্ষণে তাঁহাদের বর্ত্তমান পরিচালকগণের একটি স্থূল পরিচয় দিয়াই মদীয় বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই সম্প্রদায় পরিচালনে অধুনা—

মিশনারী :—রেভঃ জি, এবং মিসেস্ হিউজ্, তাঁহাদের সহকারী—রেভঃ পি, এইচ্, জোন্স এবং রেভঃ প্রিয়নাথ সাং।

ডাক্তার—জি, ও, এবং মিসেস্ টেইলার তাঁহাদের সহকারী—শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস (এসিঃ) এবং শ্যামাচরণ চাকমা (কম্পাউণ্ডার)।

এতদ্ব্যতীত নয়জন পাহাড়ী প্রচারক, এবং তেরজন বাঙ্গালী ও পাহাড়ী শিক্ষক আছেন।

আশা করি এতদ্দ্বারা প্রিয় পাঠকমণ্ডলী তাঁহাদের চেষ্টার উগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বলিব কি, এত প্রাণপণ যত্ন চাকমাসমাজে অতি অল্পই ফলপ্রসব করিয়াছে। পূর্ব্বে যে শিক্ষা সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তৎকল্পে তাঁহারা এই চাকমাপ্রধান চাকমা সার্কেলে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেক স্কুল রাখিয়াছিলেন। যদিও সেই সকল কোনও স্কুলে খৃষ্টিয়ান শিক্ষক ছিলেন না এবং খৃষ্টিয়ান উপদেশও দেওয়া হইত না, তথাপি চাকমাগণ তাঁহাদের প্রতি এত অবিশ্বাসী যে, অপর শিক্ষা-সাহায্য অভাবে তাহারা সন্তানগণকে অশিক্ষিত রাখিত, তবুও এই সব বিদ্যালয়ে পড়িতে দিত না; অধিকন্তু সামান্ত সামান্ত বাধাও উপস্থিত করিত। ইহাতে তাঁহারা সেই সকল স্কুল বন্ধ করিয়া দেন। এখানে কেবল খৃষ্টিয়ান বালকদিগের আবশ্যকোপযোগী ২।৩ খানি স্কুল মাত্র রাখিয়া তাঁহাদের অবশিষ্ট শিক্ষা-সাহায্য বোমাং সার্কেলে স্থানান্তরিত করিয়াছেন; তথায় কাপ্তাই উপত্যকাবাসী বহুসংখ্যক মঘ তাঁহাদের অনুযায়ী

হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা,—এই স্থল সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতেও চাক্‌মা-সমাজ দুঃখিত নহে, বরং যেন তাহারা বলিতেছে—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!"

এইরূপে, মিশনারী-চেষ্টা খুব প্রবল হইলেও, বিরাট চাক্‌মা সম্প্রদায় হইতে তাঁহারা অতি সামান্য সহানুভূতিই পাইয়াছেন। এযাবৎ সোনারাম, শ্যামাচরণ, রঘুমণি প্রভৃতি ৩,৪ জন মাত্র তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভদ্রপরিবারসম্ভূত যে একজন ছিলেন, তিনি আবার বৌদ্ধধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত তিনজনই তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে একান্ত বাধ্য। কেননা, এই সোনারাম অতি দরিদ্র চাক্‌মার সন্তান ছিল। প্রথমে বাসার চাকরী মাত্র অবলম্বন করিয়া চট্টগ্রাম যায়, তাহাতেই মিশনারী আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু তাঁহারাও তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজে পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে সে তাঁহাদের সহকারিরূপে প্রচারের কার্য্যে আছে। শ্যামাচরণও দরিদ্র-সন্তান, শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া জনৈক ত্রিপুরার অন্নে প্রতিপালিত হয়। অধুনা তাঁহাদের সাহায্য লাভ করিয়া কম্পাউণ্ডারী কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। অপর রঘুমণি এক দীন হীন বৃদ্ধ, তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের দ্বিতীয় উপায়ই নাই। বস্তুতঃ এই ধর্ম্মোন্মত্ত মিশনারী সম্প্রদায় বাড়ী ঘর আত্মীয় বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় এই সুদূর দুর্গম প্রদেশে দুশ্চর-প্রচার ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়া আছেন! তাঁহাদের এত অর্থব্যয়, এত ক্লেশ স্বীকারেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া মনে দুঃখ হয়। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, রেভঃ হিউজ্ মহোদয় আমায় লিখিয়াছেন,—"The results therefore from among the Chakmas has not been great. The number of baptised Chakmas in membership with the Christian church is small, but the number of enquirers, and of those who believe in the 'Lord Jesus Christ' as their saviour is by no means inconsiderable." অর্থাৎ 'তাই চাক্‌মাসম্প্রদায়ের মধ্যে ফল তত বেশী নহে। গির্জাভুক্ত চাক্‌মা খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা অল্প, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা স্বরূপে বিশ্বাসকারীর সংখ্যা কোনরূপে মন্দ নহে।' তিনি আরও বলেন,—"The missionaries are inspired with the hope, that when the sense of fear of consequences which now animates so many of the people passes away, the number of additions to the church will be large; and that this timidity will pass, nay, is passing they feel absolutely confident." অর্থাৎ 'মিশনারিগণ আশায় উৎফুল্ল আছেন

যে, এই অসংখ্য লোক যাহার পরিণামফলের ভয়ে এক্ষণে কাতর রহিয়াছে, যখন তাহাদের সেই ভয় চলিয়া যাইবে, তখন গির্জায় দীক্ষিতের সংখ্যা ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইবে এবং এই ভীরুতা দূর হইবে, না—চলিয়া যাইতেছে, তাহারা সম্পূর্ণ-রূপে (খৃষ্টিয়ানদের পরিণাম ফলে) বিশ্বাস উপলব্ধি করিতেছে।'

(৩)

সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন মঙ্গল কি অমঙ্গলের নিমিত্ত হইয়াছে, তাহার বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। আর তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ মন্তব্য ইংরেজ বা আমাদের কাহারও হইতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষই স্বার্থসংপৃক্ত। তবে ইহা নিশ্চিত যে, সেই বৈদিক যুগ হইতে বিচার করিলে এ জগতে আমাদের স্থান বহু উচ্চে অবস্থিত; আর তাহা ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান যুগে আমরা ইংরেজ হইতে অনেক শিখিয়াছি, এবং এখনও আমাদের সেই শিক্ষা পূর্ণ হয় নাই। যাহারা এককালে সহোদর ভ্রাতাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাহাতে বিজাতিকে আনিয়া বসাইয়াছিল এবং তাহাদের সহিতও মনোমালিন্য হওয়ায়, অপর এক বৈদেশিক শক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল, আর এক্ষণে সেই ভারতবাসী আসমুদ্র-হিমাচল ব্যাপিয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলন ধরিয়াছে—ইহাও ইংরেজ-শাসনের অন্যতম শুভময় ফল নহে কি? সে যাহা হউক, এই প্রবন্ধ তাদৃশ রাজনীতিক গবেষণার নিমিত্ত নহে। ইংরেজাধিকারে কেবল চাকমাজাতির ইষ্টানিষ্ট পর্য্যালোচনা মানসেই ইহার অবতারণা।

একটি কথা প্রথমে এস্থলে উল্লেখ করিতেই হইতেছে। সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য, রাজপুরুষগণও মনুষ্য বটেন, সুতরাং রাজশক্তি ব্যতিরিক্ত মানব-সুলভ দুর্ব্বলতাও তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে। তবে কাহারও কাহারও তাদৃশ দুর্ব্বলতা রাজশক্তির রুদ্রমূর্ত্তি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। এই গ্রন্থে তাদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত তৎসমুদায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বলিতে কি, অনেক কথা আমরা চাপিয়া যাইতে ত্রুটি করি নাই। কেননা, ব্যক্তিগত স্বার্থচেষ্টা অতি নীচতারই পরিচায়ক; পবিত্র রাজশক্তির ভিতর দিয়া তাহা দেখাইতে গেলে, রাজারই অবমাননা করা হয়। তথাপি যে কয়েক কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি, ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদানুরোধে মাত্র। তাঁহাদের তথাকথিত কার্য্যকে কেহ রাজবিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করিলে, মহাভ্রমে পতিত হইবেন।

মির মহম্মদ কাসিম বঙ্গের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইংরেজ-

কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের সর্ব্বাধিকারিত্ব দানে পুরস্কৃত করেন। তদবধি চট্টগ্রামের ভাগ্যচক্রের সঙ্গে সঙ্গে চাকমাদিগের অদৃষ্ট-নেমিও ইংরেজ-হস্তে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। তবে তদানীন্তন চাকমারাজগণ করদ ও মিত্ররাজপ্রায় ব্যবহৃত হইতেন। রাণী কালিন্দীর শাসনকাল হইতেই মিত্রতাবন্ধন ক্রমে অধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তর করিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজাধিকারে চাকমাসমাজে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে যেমন আঘাত পড়িয়াছে; সাধারণের সুখ-সুবিধা তেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান সভ্যতাদীপ্তযুগে ব্রিটিশ শাসন না আসিলেও তাদৃশ সুযোগ পাওয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা অপরাপর স্বাধীন ও মিত্ররাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারি না। কারণ পৃথিবীর বক্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এতাদৃশ পরাক্রম-শালী জাতির অধীন না হইলে, তাহাদের বর্ত্তমান উন্নতি অন্ততঃ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সংঘটিত হইত কি না, গভীর সন্দেহ আছে। ইতিপূর্ব্বে যে মুসলমানাধীনে ছিল, তাৎকালিক ইতিবৃত্তও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলাময়, এবং অশান্তিতে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ রাজা প্রবল প্রতাপশালী না হইলে দেশের শান্তিরক্ষা একরূপ অসম্ভব। তখন দক্ষিণে মঘ, পূর্ব্বে কুকি, এবং উত্তরে ত্রিপুরারাজের ক্ষমতাও কম ছিল না, মুসলমানরাজ একমাত্র পশ্চিমে থাকিয়া আশ্রিতরাজ্যের কত আর শান্তিবিধান করিতে পারেন! ইংরেজ এদেশের একচ্ছত্র সম্রাট্, সুতরাং তাঁহাদের হইতে যথার্থ আশা করা যাইতে পারে।

গ্রন্থভাগেও প্রদর্শিত হইয়াছে, ইংরেজাধিকারের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে নির্ম্মম কুকিদিগের শোচনীয় অত্যাচার অব্যাহতপ্রায় চলিতেছিল। তাহাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখিয়া অনন্তর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে গভর্ণমেণ্ট দেশ সুশাসনকল্পে যেই প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপদ্রবও কমিতে লাগিল। হায়, তখন ধনী-নির্ধন কাহারও ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ ছিল না! সকলেই সপরিবারে সতত সশঙ্কিত থাকিত। তাহাদের ভয়ে স্বামী—স্ত্রীকে, মাতা—সন্তানকে, পুত্র—জরাজীর্ণ পিতামাতাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে, এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অধিক কি, সুদূরবাসী আমরাও শিশুকালে "লেংটা কুকি"দিগের তাদৃশ পাশবিক অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া ভয়-ব্যাকুল হইতাম। আর এক্ষণে আসিয়া যাহা দেখিতেছি, তদ্দ্বারা তাহারা যে কোন কালে তেমন হিংস্র-চরিত্রের ছিল—

কিছুতেই ধারণা হয় না। "বাবু" দেখিলে, কাছে আসিতেও ভয় পায়, এবং একজন "বাবুর" সমভিব্যাহারে চারিজন কুকি চলিতেও প্রাণভয়ে কাতর হয়। ধন্য ইংরেজ-প্রভুত্ব!

ইহা হইতেই এতদ্দেশে শান্তিরক্ষায় গভর্ণমেণ্টের যোগ্যতা অক্লেশে অনুমিত হইতে পারে, তবে এই সঙ্গে একটি আনুষঙ্গিক কথা না বলিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। বিগত আদমসুমারী মতেও দেখা যায়, এতদঞ্চলে সর্ব্বসাকল্যে ২১৪১০ ঘর লোকের বসতি আছে অথচ দেশের ক্ষেত্রফল ৫১৩৮ বর্গমাইল। সুতরাং গড়ে প্রায় ¼ বর্গমাইলে এক ঘর লোকের বসতি পড়ে। ঘর-হিসাবে জনসংখ্যাও গড়ে ৫·৯ মাত্র। অতএব এই শ্বাপদসঙ্কুল দেশে এরূপ বিরলবসতি কত যে বিপজ্জনক—সামান্য অনুধাবনেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে দস্যু বা ততোধিক ভয়ানক কুকি-উপদ্রব দমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হিংস্রজন্তুর অত্যাচার যথেচ্ছ চলিতেছে। উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশও কৃষকেরা গৃহে আনিতে পায় না, তদুপরি প্রাণের ভয়ে ত নিয়তই উৎকণ্ঠায় থাকিতে হয়। এতদবস্থায় আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল—বন্দুকের সংখ্যা সমগ্র পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে দুই হাজারও নহে, অর্থাৎ প্রায় ২¼ বর্গমাইল অন্তর একটি করিয়া বন্দুক আছে। তাই আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রধান সহায় বন্দুকের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ইহাদিগের হইতে বন্দুকের টেক্স লওয়া হইত না, আজ কয়েকবৎসর হইতে বন্দুক প্রতি ।০ চারি আনা করিয়া কর বসিয়াছে। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের দেশে আমোদ তথা শিকার-প্রয়াসে মাত্র বন্দুক রাখা হইয়া থাকে, আর ইহারা তাহা শস্য এবং ততোধিক জীবনরক্ষার নিমিত্ত রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহাদিগকে এই জন্য যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া বিধেয়। আর সমস্ত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বারুদাদি বিক্রয়ের দুইটি মাত্র ডিপো আছে। অথচ একবারে তিনমাসের জন্য ৵০ আধসেরের অধিক বারুদ বিক্রয় নিষিদ্ধ। ইহাতে এক দিকে যেমন তাহাদিগকে বহুদূর হইতে দুর্গম পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া অশেষ কষ্ট পাইতে হয়, পক্ষান্তরে তিনমাসে আধসের বারুদ দ্বারা কিছুতেই চলে না। অর্দ্ধ সের বারুদে কোনরূপে শতেক বার পর্য্যন্ত গুলি ছোড়া যায়। কিন্তু হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইলে, বিশেষতঃ ফসলের পক্ষী ও বন্য পশু হইতে শস্য রক্ষা করিতে ঐ বারুদে তিনদিনও চলে না। তাই প্রার্থনা, কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য অধিক-তর কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

অবশ্য বর্ত্তমানে দেশের নানাস্থানে যেরূপ গণ্ডগোল চলিতেছে, তাহাতে আমাদের এই প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করিতে পারেন, তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, এখানে তেমন কোন গোলযোগের লক্ষণও নাই, এবং এই নিরীহ সরল প্রাণ পাহাড়ীদের মধ্যে তাদৃশ ভাব আসা সম্ভবও নহে। তবে যে মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলাচারের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক বিকৃতিমাত্র। তথাপি সন্দেহ হইলে কর্ত্তৃপক্ষ সার্কেলচিফের মত গ্রহণ করিয়া সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রার্থিত বিশেষ সুবিধা দিতে পারেন।

পথের দুর্গমতা ও আপদসঙ্কুলতা নিবন্ধন এবং সংবাদাদি প্রেরণের সুবিধা অভাবে পূর্ব্বে এদেশের আমদানী রপ্তানি প্রায় চলিত না। ইংরেজের প্রবল ক্ষমতাবলে এক্ষণে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, যাতায়াতের এবং সংবাদ প্রেরণের সুবিধাও দিন দিন অতি দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। অবশ্য ডাক ও টেলিগ্রাম সম্বন্ধে এখানে ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত সমানই ব্যবস্থা, কিন্তু রাস্তাঘাটাদির নিমিত্ত কোন পথকর নাই। এইরূপে অসুবিধা সমূহ দূরীকৃত হওয়াতে অধুনা বাণিজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত অবাধবাণিজ্যের কল্যাণে ইহাদের অশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। নতুবা একদিকে আমদানী অভাবে যেমন জীবন যাত্রা দুর্ব্বহ হইত, পক্ষান্তরে রপ্তানী না থাকিলেও ততোধিক অসুবিধা ঘটিত। অধুনা এদেশবাসিগণ বাণিজ্যের সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রমেই অধিকতরভাবে তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। এই সঙ্গে ইংরেজরাজের অন্যতম সহৃদয়তার কথা পুনরায় বলিয়া রাখা প্রয়োজন। কতিপয় বাঙ্গালী মহাজন এই নিরীহ পার্ব্বত্যদিগকে প্রতারিত করিতে যেরূপ অহর্নিশ যত্নশীল, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের সাধুচেষ্টা সবিশেষ ধন্যবাদার্হ। সুদের হার হ্রাস, ততোধিক ন্যূন সুদে ঋণদান এবং সংবৎসরোপযোগী আহার্য্যের ক্রোক প্রতিষেধ ব্যবস্থা প্রভৃতি ইংরেজরাজেরই মহতী কীর্ত্তি।

গ্রন্থভাগেই দেখিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক উৎসাহেই চাক্‌মাগণ লাঙ্গলের চাষ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই অনুরাগ বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের উপাধি প্রদানকালেও ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সার জন উড্‌বর্ণের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। বন-সংরক্ষিণী ব্যবস্থাও তাহারই অন্যতম কারণবিশেষ। মাইয়নী রিজার্ভ ছাড়িয়া দিতেও মাননীয় গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, চাঁষের ভূমির বিস্তারের নিমিত্তই ইহা করা হইল। অপরতঃ রাজা অপেক্ষা হেড্‌ম্যানদিগের দ্বারাই চাষের প্রতি লোক অধিকতর প্ররোচিত হইতে পারে, তজ্জন্য কৃষিলব্ধ রাজস্বে রাজা হইতে হেড্‌ম্যানের কমিশন ভাগ অধিক রাখা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কৃষিতে প্রথম তিন বৎসর নিষ্কর-সুবিধা দিয়া তাহা আরও লোভনীয় করিয়াছেন। তবে চাষবিস্তারের পক্ষে আর দুই অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ —বন্দোবস্তিগুলি সাধারণ 'আমল নামা' মাত্র; গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যখন তখন সেই জমি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ—ইহাতে অধীনস্বত্ব প্রদানের অধিকার নাই; এমন কি কেহ গোপনে অধীনস্বত্ব দিয়াছে প্রমাণিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার 'আমল নামা' খারিজ করিতে পারেন। অথচ গভর্ণমেণ্টের এই বিধি কার্য্যতঃ রক্ষাও হইতেছে না; শুনিতে পাই, বুদ্ধিমানগণ বিনামায় যথেষ্ট ইজারা চালাইতেছেন, কিন্তু রাজশক্তির ভয়ে সকলে সাহস না পাওয়ায় চাষবিস্তারে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তাই আমরা এস্থলে মাননীয় গভর্ণমেণ্টসমীপে উক্ত অভাবদ্বয় নিরাকরণার্থ সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছি। 'আমল নামা'র পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের রীতি থাকিলে, এতদ্দিনে খুব সম্ভব এদেশের আবাদযোগ্য প্রায় সমুদয় ভূমিতেই চাষ চলিত এবং ইহাদের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনের যে একটা উচ্ছৃঙ্খল বাসনা অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও প্রায় থাকিত না। আর এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত করা সমধিক ব্যয়সাপেক্ষ। এক একর ভূমি আবাদের উপযোগী করিতে, অন্ততঃ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়ে; এবং চাষের জন্য অন্যূন একশত টাকার এক যোড়া মহিষ প্রয়োজন। গরীব পাহাড়ীদের অনেকেই এই মূলধন অভাবে চাষে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, এবং দুঃসাহস করিয়া করিলেও অনেকে মহাজনদিগের কুসীদদায়ে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য এনিমিত্ত সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট সামান্য সুদে কৃষকদিগকে ঋণদান করিতেছেন। সেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও যখন এদেশে সর্ব্বপ্রথম লাঙ্গলের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, ইংরেজরাজ প্রজাসাধারণকে ৮০০০০ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইতে কোনরূপে মাত্র ৫০০০০ টাকা আদায় হইয়াছিল। তথাপি গভর্ণমেণ্ট আবশ্যকস্থলে ঋণদানে কুণ্ঠিত নহেন, গত বৎসরও প্রায় ২৫০০০ হাজার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু তবুও সকলের প্রয়োজনীয় অভাব মোচিত হইতেছে না। কেননা উপযুক্ত জামিন বা সম্বলের অভাবে অনেকেই ঋণ পায় না, সুতরাং অন্ততঃ সমর্থব্যক্তিগণকে ইজারা প্রদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাঁহারা অধিক পরিমাণে ভূমি আবাদ করিয়া আবশ্যকীয় মহিষাদি সহ সাধারণ্যে বিলি করিতে পারেন। চাষদ্বারা যে ইহাদের উন্নতি হইতেছে, তাহা সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন দেখিয়াই, আমরা এই দুই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর, এইচ, স্নেইড্ হাচিন্সন্ মহোদয়ের এতৎপ্রতি

সবিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাই, তিনি চাষ বিস্তারের দিকে যেরূপ যত্ন লইতেছেন, আশা করি, এই আলোচনার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিবেন।

এই সঙ্গেই আলোচনা যোগ্য, এই হতভাগ্য পাহাড়ীদিগকে গত উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে ইংরেজরাজের দয়াল হস্ত অবারিত-ভাবে অভয় প্রদান করিয়াছে। অন্যান্যবারের কথা নাই বা ধরিলাম, গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে এখানকার অবস্থা যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সহৃদয় গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্য লাভ না করিলে ইহাদের অর্দ্ধেকেরও অধিক নিশ্চিতই কালসদনে গমনে বাধ্য হইত। তাদৃশ এককালীন দান ছাড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে ইংরেজগভর্ণমেণ্ট ৬০০০৲ হাজার টাকা বিনাসুদে ঋণ দিয়াছিলেন, এবং আবশ্যক হইলে আরও দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি সতর্কদৃষ্টি ইংরেজরাজের প্রধান খ্যাতি। ইহাদিগের পূর্ব্ব-বর্ত্তিগণ রাজা হইতে এরূপ যত্ন পাইয়াছে কিনা, বিশেষ সন্দেহ আছে। ব্রিটিশা-ধিকারে আসার পর এ অঞ্চলে ক্রমে (রাঙামাটি, বান্দরবন, বড়কল, লামা, মাণিকছরী, রামগড় ও তিনটিলায়) সাতটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হই-য়াছে। এতদ্ভিন্ন বসন্তের আক্রমণ নিবারণকল্পে টীকাদানের ব্যবস্থাও কম সহৃদয়তা-পরিচায়ক নহে। তবে কিনা দেশীয় লোকের বিশ্বাস গো-বীজের টীকা বসন্তের প্রকৃষ্ট অন্তরায় নহে। তাই অধিকাংশ লোকই টীকাদানের প্রাচীন প্রথার প্রতি অধিকতর আস্থাবান্। এ সম্বন্ধে বিলাতেও আন্দোলন চলিতেছে, শুনা যায়। সে যাহা হউক এই টীকার নিমিত্তও গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয়িত হয়।

স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার কথা আইসে। কিন্তু বলিতে কি, প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাবিধানের নিমিত্তও প্রাচীন চাকমা-রাজগণ কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহীয়সী কালিন্দী রাণীর উন্নত শাসন খুঁজিয়াও তৎসম্বন্ধে কোন প্রয়াসচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইংরেজরাজ প্রত্যক্ষভাবে এদেশ শাসনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—অদ্যাপি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হয় নাই, এই স্বল্পকালমধ্যে নিরক্ষর প্রায় চাকমাসমাজ যে কি পরিমাণে শিক্ষোন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থভাগেই বিস্তারিত দেখাইয়া আসিয়াছি। এই নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় বিশ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হয়। বস্তুতঃ শিক্ষার বিস্তার ইংরেজ রাজত্বের, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুফল। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা ভারতে ইংরেজের ন্যায় আর কেহই করেন নাই। এই শিক্ষা-

বিস্তারের ফলে চাক্‌মাসমাজে এক সম্পূর্ণ নূতন উদ্দীপনা প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে নৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। এমন কি, অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনীতিক সমস্যা লইয়াও চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এইরূপে ইংরেজশাসন ইহাদের জীবন, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন লইতেছেন যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল, অনন্তর শাসন পরিচালন লইয়া দুই চারিটী কথা মাত্র পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইব। পূর্ব্বাপেক্ষা যে অধুনা সাধারণের সুবিচার লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহাতে আবার অধিকতর সুবিধা এই যে, এখানকার বিচারকার্য্যে ষ্ট্যাম্পের আবশ্যকতা নাই এবং ব্যবহারজীবীদিগেরও উৎপীড়ন নাই। সামান্য সাদা এক খণ্ড কাগজেই আবেদন গ্রাহ্য হয়, এবং বাদী প্রতিবাদিগণ ইচ্ছা করিলে নিজেরাই পরস্পর ও সাক্ষীকে প্রয়োজন মত প্রশ্ন করিতে পারে। এক কথায়, ইংরেজরাজ এখানে সহজে ও সরলভাবে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন-ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধর্ম্মে ও জাতীয়তায় আঘাত লাগিবে আশঙ্কায় তৎসংক্রান্ত বিচারাদি সমাজের প্রধানগণের উপর ন্যস্ত রাখিয়াছেন। আরও সুখের কথা, ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজকর্ম্মচারীপদে গ্রহণ করিয়াও গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছেন।

পরিশেষে আমরা সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী কাপ্তেন টমাস হার্ব্বাট লুইন মহোদয়ের কয়টী কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি। তাঁহারই দ্বারা এদেশে ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়, এবং তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এখানকার শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন। সুতরাং ইংরেজশাসনের সমালোচনা তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, আমাদিগের হাতে ততটা হওয়ার আশা নাই। তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত "পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ" নামক পুস্তকের উপসংহার শেষে লিখিয়াছেন ;—

"এক্ষণে আমি বলি, আমরা এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ নিজেদের নিমিত্ত শাসন করিব না, ইহার অধিবাসিবৃন্দের মঙ্গল এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত মাত্র শাসন দণ্ড চালাইব। তাহা সভ্যতাবিস্তারের জন্য নহে, পরন্তু সভ্যতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। এখানে কেবল একজন লোক ব্যতীত আর কিছুরই প্রয়োজন দেখা যায় না। শাসন ক্ষমতা দিয়া তাহাদের উপর একজন কর্ম্মচারী দেওয়া হউক ; তিনি যেন গভর্ণমেণ্টের বিরাট কলিচক্রের মধ্যে কেবল দড়ির ন্যায় না চলেন ; পরন্তু তাহাদের অপারগতায় সহিষ্ণু, সত্বরতার সহিত পর্য্যবেক্ষণপর,

এবং সমগ্র বসুধায় কুটুম্বজ্ঞানরূপ তাহাদের স্বাভাবিক অনুভূতিতে উপলব্ধ হন। এই নূতন ভাব সমূহ হৃদয়ঙ্গম ও তাহাদের ধারণাকে মার্জ্জিত করিয়া লইতে উপযুক্ততা থাকে, কিন্তু কোন জাতীয় সংস্কারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে যেন সাবধান রহেন। এইরূপ পরিচালনাধীনে তাহাদের নিজেকেই শনৈঃ শনৈঃ সভ্যতা লাভ করিতে দেওয়া হউক। শিক্ষাব্যবস্থা তাহাদের সম্মুখে, উন্মুক্ত থাকুক, তাহারা তাহা স্বকীয় বিধি ব্যবস্থা মতে চালাইয়া—বিনষ্ট ও বিকৃত ইংরেজী আদর্শে নহে, পরমেশ্বরের সৃষ্টপ্রাণীর নূতন ও মহান্ স্বরূপে বাহির হইয়া আসিবে।" (১১৮ পৃষ্ঠা।)

আমরাও তদীয় উদার উপদেশের সহিত একমত হইয়া—ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি, প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান রাজা ও রাজশক্তির চিরকামনীয় হউক।

সমাপ্ত।